বিংশতি অধ্যায়

পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ভগবানপি বৈকুণ্ঠঃ সাকং মঘবতা বিভুঃ ।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিস্তুষ্টো যজ্ঞভুক্ তমভাষত ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু; **অপি**—ও; **বৈকুণ্ঠঃ**—বৈকুণ্ঠপতি; **সাকম্**—সহ; **মঘবতা**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বিভুঃ**—ভগবান; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **যজ্ঞপতিঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর; **তুষ্টঃ**—প্রসন্ন হয়েছিলেন; **যজ্ঞ-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা; **তম্**—পৃথু মহারাজকে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—হে বিদুর! নিরানব্বইটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, দেবরাজ ইন্দ্রসহ সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার পর তিনি বলেছিলেন।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

এষ তেঽকার্ষীদ্ভদ্রং হয়মেধশতস্য হ ।
ক্ষমাপয়ত আত্মানমমুষ্য ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন; **এষঃ**—এই ইন্দ্রদেব; **তে**—তোমার; **অকার্ষীৎ**—করেছিল; **ভঙ্গম্**—বিঘ্ন; **হয়**—অশ্ব; **মেধ**—যজ্ঞ; **শতস্য**—এক শতের; **হ**—বাস্তবিকপক্ষে; **ক্ষমাপয়ত**—ক্ষমাপ্রার্থী; **আত্মানম্**—তোমাকে; **অমুষ্য**—তাকে; **ক্ষন্তুম্**—ক্ষমা করা; **অর্হসি**—উচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন—হে মহারাজ পৃথু! ইন্দ্র তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এখন সে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তোমার কাছে এসেছে। তাই তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *আত্মানম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যোগী এবং জ্ঞানীদের মধ্যে পরস্পরকে (এমন কি সাধারণ মানুষকেও) আত্মা বলে সম্বোধন করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে, কারণ পরমার্থবাদী কখনও জীবকে তার দেহ বলে মনে করেন না। আত্মা যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, আত্মা ও পরমাত্মা গুণগতভাবে অভিন্ন। পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে যে, দেহ কেবল বাহ্যিক আবরণ মাত্র, এবং তার ফলে উন্নত স্তরের পরমার্থবাদী কখনও নিজের ও অন্যের মধ্যে ভেদ দর্শন করেন না।

শ্লোক ৩

সুধিয়ঃ সাধবো লোকে নরদেব নরোত্তমাঃ ।
নাভিদ্রুহ্যন্তি ভূতেভ্যো যর্হি নাত্মা কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

সু-ধিয়ঃ—পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **সাধবঃ**—যাঁরা কল্যাণমূলক কার্যকলাপে উদ্যোগী; **লোকে**—এই জগতে; **নর-দেব**—হে রাজন্; **নর-উত্তমাঃ**—নরশ্রেষ্ঠ; **ন অভিদ্রুহ্যন্তি**—কখনও বিদ্বেষ-পরায়ণ হন না; **ভূতেভ্যঃ**—অন্য জীবদের প্রতি; **যর্হি**—কারণ; **ন**—কখনই না; **আত্মা**—আত্মা; **কলেবরম্**—এই শরীর।

অনুবাদ

হে রাজন্! যাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং অন্যের হিতসাধনে রত, মনুষ্য-সমাজে তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। তাঁরা কখনও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হন না। তাঁরা ভালভাবে জানেন যে, আত্মা থেকে এই জড় দেহ ভিন্ন।

তাৎপর্য

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, কোন পাগল যদি কাউকে হত্যা করে, তা হলে উচ্চ বিচারালয়েও তার অপরাধ ক্ষমা করা হয়। তার কারণ হচ্ছে যে, জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, তার স্বরূপে সে সর্বদাই শুদ্ধ। কিন্তু যখন সে মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়, তখন সে প্রকৃতির তিন গুণের শিকার হয়। বাস্তবিকপক্ষে, সে যা কিছুই করে, তা প্রকৃতির প্রভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৪) বলা হয়েছে—

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

"দেহরূপী নগরীর অধীশ্বর দেহী কর্ম সৃষ্টি করে না, কাউকে সে কর্মে প্রবৃত্ত করে না, অথবা সে কর্মফলও সৃষ্টি করে না। তা সবই অনুষ্ঠিত হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে।"

প্রকৃতপক্ষে জীব অথবা আত্মা কোন কিছুই করে না; সব কিছুই সম্পাদিত হয় প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। কোন মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন রোগের লক্ষণগুলি সমস্ত বেদনার কারণ হয়। যারা পারমার্থিক চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নত, তারা আত্মার প্রতি অথবা জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আত্মার কার্যকলাপের প্রতি কখনও মাৎসর্য-পরায়ণ হন না। উন্নত স্তরের পরমার্থবাদীকে বলা হয় *সুধিয়ঃ* । *সুধী* মানে 'বুদ্ধি', *সুধী* মানে 'অত্যন্ত উন্নত' এবং *সুধী* মানে 'ভক্ত'। যারা ভগবদ্ভক্ত এবং অত্যন্ত উন্নত স্তরের বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন, তাঁরা কখনও আত্মা অথবা দেহের বিরুদ্ধে কিছু করেন না। যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, তা হলে তিনি তা ক্ষমা করেন। তাই বলা হয় যে, ক্ষমা হচ্ছে পারমার্থিক স্তরে উন্নত ব্যক্তির একটি গুণ।

শ্লোক ৪

পুরুষা যদি মুহ্যন্তি ত্বাদৃশা দেবমায়য়া ।
শ্রম এব পরং জাতো দীর্ঘয়া বৃদ্ধসেবয়া ॥ ৪ ॥

পুরুষাঃ—মানুষ; **যদি**—যদি; **মুহ্যন্তি**—মোহাচ্ছন্ন হয়; **ত্বাদৃশাঃ**—তোমার মতো; **দেব**—ভগবানের; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **শ্রমঃ**—পরিশ্রম; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পরম্**—কেবল; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **দীর্ঘয়া**—দীর্ঘকাল ধরে; **বৃদ্ধ-সেবয়া**—গুরুজনদের সেবার দ্বারা।

অনুবাদ

পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ পালন করার ফলে, পারমার্থিক জীবনে উন্নত তোমার মতো ব্যক্তিরাও যদি আমার মায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়, তা হলে তোমার পারমার্থিক উন্নতি কেবল সময়ের অনর্থক অপচয় বলেই মনে করা হবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বৃদ্ধ-সেবয়া* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তার অর্থ হচ্ছে 'গুরুজনদের সেবার দ্বারা'। আচার্য অথবা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে হয়। পরম্পরা ধারায় শিক্ষা লাভ না করে, কেউ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। পৃথু মহারাজ সেই ধারায় পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিলেন; তাই তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত ছিল না। দেহাত্মবুদ্ধি-সর্বস্ব সাধারণ মানুষ সর্বদা জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।

শ্লোক ৫

অতঃ কায়মিমং বিদ্বানবিদ্যাকামকর্মভিঃ ।
আরব্ধ ইতি নৈবাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধোঽনুষজ্জতে ॥ ৫ ॥

অতঃ—অতএব; **কায়ম্**—দেহ; **ইমম্**—এই; **বিদ্বান্**—জ্ঞানবান; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের দ্বারা; **কাম**—বাসনাসমূহ; **কর্মভিঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা; **আরব্ধ**—সৃষ্টি করেছে; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—কখনই না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অস্মিন্**—এই শরীরকে; **প্রতিবুদ্ধঃ**—জ্ঞানী; **অনুষজ্জতে**—আসক্ত হয়।

অনুবাদ

যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধির কারণ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, যাঁরা জানেন যে, এই দেহ মায়াজনিত অবিদ্যা, কাম ও কর্মের দ্বারা সৃষ্ট, তাঁরা কখনও দেহের প্রতি আসক্ত হন না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাঁরা সুন্দর বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন *(সুধিয়ঃ)*, তাঁরা কখনও তাঁদের দেহকে তাঁদের স্বরূপ বলে মনে করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার ফলে, শরীরের দুই প্রকার কার্য রয়েছে। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে, যখন

আমরা মনে করি যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের ফলে আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারব, তখন আমরা মোহাচ্ছন্ন থাকি। আর এক প্রকার মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হচ্ছে, মায়িক শরীর থেকে উৎপন্ন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টার দ্বারা সুখী হওয়া যাবে বলে মনে করা অথবা স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার দ্বারা অথবা নানা প্রকার বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা সুখী হওয়া যাবে বলে মনে করা। এগুলি হচ্ছে মায়া। তেমনই, রাজনৈতিক উত্থান এবং সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের অনুষ্ঠানের দ্বারা সারা পৃথিবীর মানুষকে সুখী করা যাবে বলে মনে করাও মায়া, কারণ সেই সবই দেহাত্মবুদ্ধি-জাত। দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্তী হয়ে আমরা যা কিছু কামনা করি অথবা অনুষ্ঠান করি তা সবই মায়িক। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু পৃথু মহারাজকে বলেছিলেন যে, যদিও যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের কাছে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তবুও তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোন প্রয়োজন ছিল না। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪৫) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥

"বেদ প্রধানত প্রকৃতির তিন গুণের বিষয়ে আলোচনা করে। কিন্তু অর্জুন, তুমি গুণাতীত হও। সমস্ত দ্বন্দ্বভাব এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, প্রকৃত লাভের জন্য আত্মতত্ত্বে অধিষ্ঠিত হও।"

বেদে যে-সমস্ত কর্মের বিধান রয়েছে, তা মুখ্যত প্রকৃতির তিন গুণের উপর নির্ভর করে। তাই অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত বৈদিক কার্যকলাপের অতীত হতে। অর্জুনকে ভগবান যে-সমস্ত কার্যকলাপের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তির কার্যকলাপ।

শ্লোক ৬

অসংসক্তঃ শরীরেঽস্মিন্নমুনোৎপাদিতে গৃহে ।
অপত্যে দ্রবিণে বাপি কঃ কুর্যান্মমতাং বুধঃ ॥ ৬ ॥

অসংসক্তঃ—অনাসক্ত হয়ে; **শরীরে**—শরীরের প্রতি; **অস্মিন্**—এই; **অমুনা**—এই প্রকার দেহাত্মবুদ্ধি থেকে; **উৎপাদিতে**—উৎপন্ন; **গৃহে**—গৃহে; **অপত্যে**—সন্তান; **দ্রবিণে**—সম্পত্তি; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **কঃ**—কে; **কুর্যাৎ**—করবে; **মমতাম্**—আসক্তি; **বুধঃ**—বিজ্ঞ ব্যক্তি।

অনুবাদ

সম্পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত যে-অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার গৃহ, অপত্য, বিত্ত আদি শারীরিক বিষয়ের প্রতি মমতা থাকবে কি করে?

তাৎপর্য

বৈদিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান করা। কিন্তু, এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা যায় না। বরং, এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা, ভগবানের অনুমতিক্রমে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে বিশেষভাবে আগ্রহী জড়বাদীদের এই সমস্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের অনুমতি দেওয়া হয়। তাকে বলা হয় *ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ* । জড়া প্রকৃতির গুণের ভিত্তিতে এই সমস্ত বৈদিক কার্যকলাপের অনুষ্ঠান হয়। যাঁরা জড়াতীত স্তরে রয়েছেন, তাঁরা এই সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে মোটেই আগ্রহী নন। বরং, তারা ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবার উচ্চতর কার্যকলাপে আগ্রহী। এই প্রকার ভক্তিকে বলা হয় *নিস্ত্রৈগুণ্য* । দেহসুখ উপভোগের জড়-জাগতিক ধারণার সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ৭

একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ ।
সর্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥ ৭ ॥

একঃ—এক; **শুদ্ধঃ**—শুদ্ধ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতির্ময়; **নির্গুণঃ**—ভৌতিক গুণরহিত; **অসৌ**—তা; **গুণ-আশ্রয়ঃ**—সদ্‌গুণের আধার; **সর্ব-গঃ**—সর্বত্র গমনাগমনে সক্ষম; **অনাবৃতঃ**—জড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত না হয়ে; **সাক্ষী**—সাক্ষী; **নিরাত্মা**—অন্য কিছুতে আত্মবুদ্ধি না করে; **আত্ম-আত্মনঃ**—দেহ এবং মনে; **পরঃ**—অতীত।

অনুবাদ

আত্মা এক, শুদ্ধ, চিন্ময় এবং স্বতঃপ্রকাশ। তিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার, এবং সর্বব্যাপ্ত। তিনি জড় আবরণ-রহিত, এবং তিনি সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। তিনি অন্য সমস্ত জীব থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, এবং তিনি সমস্ত দেহধারী আত্মার অতীত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে *অসংসক্তঃ* অর্থাৎ 'আসক্তি-রহিত', এবং *বুধঃ* অর্থাৎ 'সব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবগত', এই দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সম্পূর্ণরূপে অবগত মানে হচ্ছে, নিজের স্বরূপ এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, এই শ্লোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণু নিজেকে বা পরমাত্মাকে বর্ণনা করছেন। পরমাত্মা সর্বদাই দেহধারী জীবাত্মা ও জড় জগৎ থেকে ভিন্ন। তাই, এখানে তাঁকে *পর* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই *পর* বা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 'এক'। ভগবান এক, কিন্তু এই জড় জগতে জড় দেহধারী বদ্ধ জীবাত্মা নানারূপে বিরাজ করে। যেমন—দেবতা, মানুষ, পশু, বৃক্ষ, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। এইভাবে জীব এক নয়, বহু। *বেদে* প্রতিপন্ন হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীব বহু, এবং তারা শুদ্ধ নয়। কিন্তু, পরমেশ্বর ভগবান শুদ্ধ ও অনাসক্ত। জড় দেহের আবরণে আবৃত হওয়ার ফলে, জীব স্বতঃপ্রকাশ নয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশ। জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে, জীবকে বলা হয় *সগুণ,* কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা হচ্ছেন নির্গুণ, অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন। জড় গুণের দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে জীব *গুণাশ্রিত,* কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান *গুণাশ্রয়* । বদ্ধ জীবের দৃষ্টি জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত; তাই সে তার কার্যকলাপের কারণ দর্শন করতে পারে না, এবং তার বিগত জীবন দর্শন করতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান জড় দেহের দ্বারা আবৃত না হওয়ার ফলে, জীবের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই*আত্মা* । গুণগতভাবে তাঁরা এক, তবুও তাঁরা ভিন্ন, বিশেষ করে ষড়ৈশ্বর্যের ব্যাপারে। পূর্ণজ্ঞান মানে হচ্ছে জীবাত্মার পক্ষে তার নিজের স্থিতি ও পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে পূর্ণ জ্ঞান।

শ্লোক ৮

য এবং সন্তমাত্মানমাত্মস্থং বেদ পূরুষঃ ।
নাজ্যতে প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ স ময়ি স্থিতঃ ॥ ৮ ॥

যঃ—যে-কেউ; **এবম্**—এইভাবে; **সন্তম্**—বিরাজমান হয়ে; **আত্মানম্**—জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে; **আত্ম-স্থম্**—তাঁর দেহে অবস্থিত হয়ে; **বেদ**—জানেন; **পূরুষঃ**—ব্যক্তি;

ন—কখনই না; **অজ্যতে**—প্রভাবিত হন; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতিতে; **স্থঃ**—অবস্থিত; **অপি**—যদিও; **তৎ-গুণৈঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ময়ি**—আমাতে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি পরমাত্মা ও আত্মা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত, তিনি জড়া প্রকৃতিতে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কখনই প্রভাবিত হন না, কারণ তিনি সর্বদাই আমার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় অবস্থিত।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই, যিনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তিনি এই জড় শরীরে বা জড় জগতে থাকলেও, জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ, তিনিই জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হন।" এই সম্পর্কে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কেউ যদি তাঁর দেহ, বাণী ও মনের দ্বারা সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তা হলে জড় জগতে অবস্থান করলেও, তাঁকে মুক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে।

শ্লোক ৯

যঃ স্বধর্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি ॥ ৯ ॥

যঃ—যিনি; **স্ব-ধর্মেণ**—তাঁর বৃত্তির দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **নিত্যম্**—নিয়মিতভাবে; **নিরাশীঃ**—কোন প্রকার উদ্দেশ্য-রহিত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তিসহকারে; **অন্বিতঃ**—যুক্ত; **ভজতে**—আরাধনা করেন; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **তস্য**—তাঁর; **মনঃ**—মন; **রাজন্**—হে পৃথু মহারাজ; **প্রসীদতি**—সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু বললেন—হে পৃথু মহারাজ! কেউ যখন তাঁর স্বধর্মে অবস্থিত হয়ে, কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা না করে, আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি ধীরে ধীরে তাঁর অন্তরে অনাবিল তৃপ্তি আস্বাদন করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটির বক্তব্য *বিষ্ণু পুরাণেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। জীবের স্বধর্ম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং তা সমাজের চারটি বিভাগ ও জীবনের চারটি স্তরে—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাসে প্রয়োগ হয়। কেউ যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে আচরণ করেন এবং কোন রকম কর্মফলের প্রত্যাশা না করেন, তা হলে তিনি ধীরে ধীরে তৃপ্তি লাভ করেন। স্বধর্ম আচরণের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। *ভগবদ্গীতায়* এই পন্থাটিকে কর্মযোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সেবা ও সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম করা কর্তব্য। তা না হলে আমরা কর্মফলের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ব।

সকলেরই স্বধর্ম রয়েছে, কিন্তু সেই জড়-জাগতিক বৃত্তিটি কখনই জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে সাধন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তার বৃত্তিগত কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করা। ব্রাহ্মণের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, জড়-জাগতিক লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর বৃত্তি সম্পাদন করার পরিবর্তে, পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের উদ্দেশ্যে তা অনুষ্ঠান করা। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদেরও সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করা কর্তব্য। এই জড় জগতে সকলেই নানা প্রকার বৃত্তিগত কার্যকলাপে যুক্ত, কিন্তু এই সমস্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা। ভগবদ্ভক্তি অত্যন্ত সরল, এবং যে-কেউই তা সম্পাদন করতে পারে। যে যেখানে রয়েছে, সে সেখানেই থাকতে পারে; কেবল তাকে তার গৃহে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রীবিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ হতে পারেন অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে পারেন (ভগবানের অন্য বহু রূপ রয়েছে)। এইভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাঁর সৎ কর্মের ফলের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। মানুষ তার বৃত্তি নির্বিশেষে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, আত্মনিবেদন আদি ভগবদ্ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারে। এইভাবে অনায়াসে ভগবানের সেবা করা যায়। ভগবান যখন কারও সেবায় সন্তুষ্ট হন, তখন তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

শ্লোক ১০

পরিত্যক্তগুণঃ সম্যগ্‌দর্শনো বিশদাশয়ঃ ।
শান্তিং মে সমবস্থানং ব্রহ্ম কৈবল্যমশ্নুতে ॥ ১০ ॥

পরিত্যক্ত-গুণঃ—যিনি জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়েছেন; **সম্যক্**—সম; **দর্শনঃ**—যাঁর দৃষ্টি; **বিশদ**—নিষ্কলুষ; **আশয়ঃ**—যাঁর মন অথবা হৃদয়; **শান্তিম্**—শান্তি; **মে**—আমার; **সমবস্থানম্**—সমপদ; **ব্রহ্ম**—চিন্ময়; **কৈবল্যম্**—জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্তি; **অশ্নুতে**—লাভ করে।

অনুবাদ

হৃদয় যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্তের মন উদার ও স্বচ্ছ হয়, এবং তিনি তখন সব কিছুই সমভাবে দর্শন করেন। জীবনের সেই অবস্থায় শান্তি লাভ হয়, এবং তিনি তখন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপী আমার সমপদ প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

কৈবল্য সম্বন্ধে মায়াবাদীদের ধারণা বৈষ্ণবদের থেকে ভিন্ন। মায়াবাদীরা মনে করে যে, জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই, জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। কিন্তু কৈবল্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত ভিন্ন। বৈষ্ণবেরা তাঁদের নিজেদের স্থিতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত। নির্মল স্তরে জীব বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস, এবং সেই অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মভূত স্থিতি বা জীবের পারমার্থিক পূর্ণতা। ভগবানের সঙ্গে প্রেমের এই আদান-প্রদান অতি সহজে সাধন করা সম্ভব। *ভগবদ্‌গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ যখন ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ চিন্ময় *কৈবল্য* স্তর বা *ব্রহ্মভূত* স্তর প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১১

উদাসীনমিবাধ্যক্ষং দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মনাম্ ।
কূটস্থমিমমাত্মানং যো বেদাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ১১ ॥

উদাসীনম্—উদাসীন; **ইব**—কেবল; **অধ্যক্ষম্**—অধ্যক্ষ; **দ্রব্য**—জড় উপাদানের; **জ্ঞান**—জ্ঞানেন্দ্রিয়; **ক্রিয়া**—কর্মেন্দ্রিয়; **আত্মনাম্**—মনের; **কূটস্থম্**—স্থির; **ইমম্**—

এই; **আত্মানম্**—আত্মা; **যঃ**—যিনি; **বেদ**—জানেন; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হন; **শোভনম্**—সৌভাগ্য।

অনুবাদ

যিনি জানেন যে, এই জড় দেহ পঞ্চ-মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গঠিত, এবং আত্মা স্থির ও উদাসীন হয়ে এই সবের অধ্যক্ষতা করে, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্য।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষ কিভাবে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। সর্বপ্রথমে জানতে হবে যে, আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মাকে বলা হয় *দেহী,* এবং জড় শরীরকে বলা হয় *দেহ* । প্রতিনিয়ত দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়; তাই আত্মাকে বলা হয় *কূটস্থম্* । প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতিক্রিয়ার ফলে, দেহের পরিবর্তন সাধিত হয়। যিনি আত্মার স্থির স্থিতি সম্বন্ধে অবগত, তিনি সুখ ও দুঃখরূপে প্রকৃতির গুণের মিথষ্ক্রিয়ার দ্বারা বিচলিত হন না। *ভগবদ্গীতায়ও* শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, জড় দেহের উপর জড়া প্রকৃতির গুণের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যেহেতু সুখ ও দুঃখের গমনাগমন হয়, তাই তার দ্বারা বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কখনও কখনও বিচলিত হয়ে পড়লেও, তা সহ্য করতে শেখা উচিত। জীবের কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্ত বাহ্য দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি সর্বদা উদাসীন থাকা।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম দেহ থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই আটটি উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কারও বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনই এই অনাসক্তির স্তর প্রাপ্ত হওয়ার উপায়। যিনি দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের সেবায় যুক্ত, তিনিই কেবল জড় দেহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন। কেউ যখন কোন বিশেষ চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হন, তখন তিনি বাইরের কোন কিছু শুনতে পান না অথবা দেখতে পান না, যদিও সেগুলি তাঁর উপস্থিতিতে ঘটছে। তেমনই, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকেন, তাঁরা বাহ্যিক জড় দেহে কি হচ্ছে সেই সম্বন্ধে গ্রাহ্য করেন না। সেই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। যিনি এই সমাধি লাভ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম যোগী।

শ্লোক ১২

ভিন্নস্য লিঙ্গস্য গুণপ্রবাহো
দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মনঃ ।
দৃষ্টাসু সম্পৎসু বিপৎসু সূরয়ো
ন বিক্রিয়ন্তে ময়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ১২ ॥

ভিন্নস্য—ভিন্ন; **লিঙ্গস্য**—দেহের; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের; **প্রবাহঃ**—নিরন্তর পরিবর্তন; **দ্রব্য**—ভৌতিক উপাদান-সমূহ; **ক্রিয়া**—ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ; **কারক**—দেবতাগণ; **চেতনা**—মন; **আত্মনঃ**—গঠিত; **দৃষ্টাসু**—যখন অনুভব করা হয়; **সম্পৎসু**—সুখ; **বিপৎসু**—দুঃখ; **সূরয়ঃ**—যাঁরা উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন; **ন**—কখনই না; **বিক্রিয়ন্তে**—বিচলিত হন; **ময়ি**—আমাতে; **বদ্ধ-সৌহৃদাঃ**—বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

ভগবান বিষ্ণু পৃথু মহারাজকে বললেন—হে রাজন্! প্রকৃতির তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার প্রভাবে এই জড় জগতে নিরন্তর পরিবর্তন হয়। পঞ্চ-মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ, ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা দেবতাগণ, এবং মন, যা আত্মার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়—এই সবের সমন্বয়ে দেহ গঠিত হয়। যেহেতু স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদানের এই সমন্বয় থেকে আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাই আমার সঙ্গে সুদৃঢ় সৌহার্দ্য ও স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ আমার ভক্ত পূর্ণজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে, জড় জগতের এই সুখ ও দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না।

তাৎপর্য

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জীবকে যদি দেহের কার্যকলাপের অধ্যক্ষতা করতে হয়, তা হলে সে দেহের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন থাকতে পারে কিভাবে? তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে—এই সমস্ত কার্যকলাপ জীবাত্মার কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া যায়—একজন ব্যবসায়ী তার গাড়িতে বসে যখন কোথাও যান, তখন তিনি নিরীক্ষণ করেন গাড়িটি কিভাবে চলছে এবং সেই অনুসারে গাড়ির চালককে তিনি নির্দেশ দেন। তিনি জানেন কতটা তেল খরচ হচ্ছে, এবং এইভাবে তিনি গাড়িটির সমস্ত বিষয়ে অবগত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গাড়িটি থেকে ভিন্ন এবং তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে তিনি অনেক

বেশি সচেতন। গাড়িতে করে যাওয়ার সময়েও, তিনি তাঁর ব্যবসা এবং অফিস সম্বন্ধেই চিন্তা করেন। গাড়িটিতে বসে থাকলেও গাড়িটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই। একজন ব্যবসায়ী যেমন সর্বদা তাঁর ব্যবসার চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তেমনই জীবও ভগবানের প্রেমময়ী সেবার চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন। তখন তাঁর পক্ষে তাঁর জড় দেহের কার্যকলাপ থেকে স্বতন্ত্র থাকা সম্ভব। এই প্রকার উদাসীন অবস্থা কেবল ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

বদ্ধ-সৌহৃদাঃ—'বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ' শব্দটি বিশেষভাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীরা ভগবদ্ভক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে না। কর্মীরা দেহের কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। তাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে কেবল দেহটির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জ্ঞানীরা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তারা মুক্তি লাভ করতে পারে না। যেহেতু তারা পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেনি, তাই তারা ব্রহ্ম অনুভূতির অতি উচ্চ পদ থেকে অধঃপতিত হয়। যোগীরাও দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন—তারা মনে করে যে, ধারণা, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি দৈহিক ব্যায়ামের মাধ্যমে তারা পারমার্থিক বস্তু লাভ করতে পারবে। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে, ভক্ত সর্বদাই চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত। তাই, দেহের কর্ম এবং ফল থেকে স্বতন্ত্র থেকে প্রকৃত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা, অর্থাৎ ভগবানের সেবা করা, কেবল ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

শ্লোক ১৩

সমঃ সমানোত্তমমধ্যমাধমঃ
সুখে চ দুঃখে চ জিতেন্দ্রিয়াশয়ঃ ।
ময়োপকুপ্তাখিললোকসংযুতো
বিধৎস্ব বীরাখিললোকরক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

সমঃ—সমভাব; **সমান**—সমান; **উত্তম**—শ্রেষ্ঠ; **মধ্যম**—অন্তর্বর্তী স্থিতিসম্পন্ন; **অধমঃ**—নিকৃষ্ট; **সুখে**—সুখে; **চ**—এবং; **দুঃখে**—দুঃখে; **চ**—ও; **জিত-ইন্দ্রিয়**—যিনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি জয় করেছেন; **আশয়ঃ**—মন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উপকুপ্ত**—আয়োজিত; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—মানুষদের দ্বারা; **সংযুতঃ**—মিলিত হয়ে; **বিধৎস্ব**—প্রদান কর; **বীর**—হে বীর; **অখিল**—সমস্ত; **লোক**—প্রজাদের; **রক্ষণম্**—রক্ষা।

অনুবাদ

হে বীর রাজা! সর্বদা সমভাবাপন্ন হয়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্ত মানুষদের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর। অনিত্য সুখদুঃখে বিচলিত হয়ো না। সর্বতোভাবে তোমার মন ও ইন্দ্রিয় সংযত কর। আমার ব্যবস্থাপনায়, তুমি জীবনের যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সর্বদা চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে, রাজারূপে তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার চেষ্টা কর। তোমার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে তোমার রাজ্যের প্রজাদের রক্ষা করা।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়ার একটি খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে হোক অথবা তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই হোক, ভগবানের আদেশ পালন করাই মানুষের কর্তব্য। অর্জুন প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন। তেমনই, এখানে পৃথু মহারাজও তাঁর কর্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন। *ভগবদ্‌গীতার* নির্দেশ নিষ্ঠাসহকারে আমাদের পালন করা উচিত। *ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ*—প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির নির্দেশ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলে মনে করে পালন করা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, মুক্তি লাভ হবে কি না সেই সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা না করে, শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করে যাওয়া উচিত। তা করলে, তিনি সর্বদাই মুক্ত থাকবেন। বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং আশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ধর্ম অনুসারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা সাধারণ মানুষের কর্তব্য। কেউ যদি কেবল নিষ্ঠাসহকারে এবং নিয়মিতভাবে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তা হলে তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা-বিধান করতে পারবেন।

পৃথু মহারাজ ছিলেন একজন রাজা, তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে সর্বদা দৈহিক কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন থেকে, ভগবানের সেবায় সংলগ্ন হয়ে মুক্ত স্তরে স্থিত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। পূর্ববর্তী শ্লোকের *বদ্ধ-সৌহৃদাঃ* শব্দটি এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দেহের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন হয়ে, ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়া যায় অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির নির্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্তি আচরণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে নির্দেশ প্রদান করে ভগবান আমাদের সাহায্য

করেন। বাইরে তিনি গুরুরূপে আমাদের নির্দেশ দেন। তাই, শ্রীগুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। ভগবান বলেছেন, *আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ*—গুরুদেবকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৭/২৭)। শ্রীগুরুদেবেকে পরমেশ্বর ভগবান বলেই মনে করা উচিত এবং কখনও তাঁর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হওয়া উচিত নয় অথবা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। আমরা যদি শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করি এবং ভগবদ্ভক্তি আচরণ করি, তা হলে আমরা সর্বদাই জড় দেহের ও জড় কার্যকলাপের কলুষ থেকে মুক্ত থাকব, এবং আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ১৪

শ্রেয়ঃ প্রজাপালনমেব রাজ্ঞো
যৎসাম্পরায়ে সুকৃতাৎ ষষ্ঠমংশম্ ।
হর্তান্যথা হৃতপুণ্যঃ প্রজানা-
মরক্ষিতা করহারোঽঘমত্তি ॥ ১৪ ॥

শ্রেয়ঃ—শুভ; **প্রজা-পালনম্**—জনসাধারণকে শাসন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার পক্ষে; **যৎ**—যেহেতু; **সাম্পরায়ে**—পরবর্তী জীবনে; **সুকৃতাৎ**—পুণ্যকর্ম থেকে; **ষষ্ঠম্ অংশম্**—ছয় ভাগের এক ভাগ; **হর্তা**—সংগ্রহকারী; **অন্যথা**—নতুবা; **হৃত-পুণ্যঃ**—পুণ্যকর্মের ফল থেকে বঞ্চিত হয়ে; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **অরক্ষিতা**—যিনি রক্ষা করেন না; **কর-হারঃ**—কর সংগ্রাহক; **অঘম্**—পাপ; **অত্তি**—প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

রাজার ধর্ম হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের রক্ষা করা। এইভাবে আচরণ করার ফলে, রাজা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রজাদের পুণ্যকর্মের এক-ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কেবল প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করে কিন্তু তাদের যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না, সেই রাজার পুণ্যফল প্রজারা হরণ করে, এবং তার প্রজাদের পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সকলেই যদি জড় জগতের প্রতি উদাসীন হয়ে মুক্তি লাভের জন্য পারমার্থিক কার্যকলাপে যুক্ত হন, তা হলে সব কিছু চলবে কি করে? আর যদি সব কিছু যথাযথভাবে চালাতে হয়, তা হলে রাজার পক্ষে সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হয় কি করে? সেই প্রশ্নের উত্তরে, এখানে *শ্রেয়ঃ* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান অন্ধের মতো অথবা ঘটনাক্রমে সমাজের বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেননি, যে-কথা মূর্খ মানুষেরা বলে থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এমন কি শূদ্রেরও কর্তব্য হচ্ছে, যথাযথভাবে তাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা। এবং তার ফলে তারা সকলেই জীবনের চরম সিদ্ধি—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—*স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*—"নিজের নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের ফলে, পরমসিদ্ধি লাভ করা যায়।" ভগবান শ্রীবিষ্ণু পৃথু মহারাজকে তাঁর প্রজা পালনের দায়িত্বভার ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে মুক্তিলাভের জন্য হিমালয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেননি। তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর রাজকার্য সম্পাদন করেই তিনি মুক্তিলাভ করতে পারেন। রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হচ্ছে প্রজা বা জনসাধারণ যাতে তাদের পারমার্থিক মুক্তিলাভের জন্য তাদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে তা দেখা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে প্রজাদের কার্যকলাপের প্রতি উদাসীন রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানকে সেই উদ্দেশ্যে কোন কিছু করার প্রয়োজন হয় না। আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় প্রজাদের কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য করার জন্য বহু আইন-কানুন রয়েছে, কিন্তু প্রজাদের পারমার্থিক জ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে কি না, সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সরকার সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকে। তার ফলে, ভগবৎ-চেতনা বা পারমার্থিক জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ হয়ে, প্রজারা তাদের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করে এবং তার ফলে তারা পাপকর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

একজন রাষ্ট্র-প্রধানের জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি উদাসীন থেকে কেবল তাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা উচিত নয়। রাজার প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে, প্রজারা যাতে ধীরে ধীরে পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে তা দেখা। কৃষ্ণভক্তি লাভ করা মানে সব রকম পাপকর্ম থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া। রাজ্য থেকে পাপকর্ম যখন সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হয়, তখন আর যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে পৃথিবীর অবস্থা

সেই রকম ছিল। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি প্রজাদের কৃষ্ণভক্ত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, তা হলেই কেবল তিনি প্রজা-শাসনের যোগ্য; তা না হলে তার কর সংগ্রহ করার কোন অধিকার নেই। রাজা যদি প্রজাদের পারমার্থিক কল্যাণ সাধনে সচেতন থাকেন, তা হলেই তিনি অনায়াসে কর সংগ্রহ করতে পারেন। তার ফলে রাজা ও প্রজা ইহলোকে সুখী হন, এবং পরলোকে রাজা তাঁর প্রজাদের পুণ্য কর্মের এক ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হতে পারেন। তা না হলে, পাপী প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করার ফলে, তাকে তাদের পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হবে।

পিতামাতা এবং গুরুদেবের ক্ষেত্রেও সেই নিয়মটি প্রযোজ্য। পিতামাতা যদি কেবল কুকুর-বিড়ালের মতো সন্তান উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে না পারে, তা হলে তারা তাদের পশুতুল্য সন্তানদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী হয়। সম্প্রতি, এই সমস্ত সন্তানেরা হিপী হয়ে যাচ্ছে। তেমনই, গুরু যদি শিষ্যকে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার নির্দেশ না দিতে পারে, তা হলে তাকে তাদের পাপকর্মের জন্য দায়ী হতে হবে। প্রকৃতির এই সমস্ত সূক্ষ্ম নিয়মগুলি মানব-সমাজের বর্তমান নেতাদের জানা নেই। যেহেতু সমাজের নেতারা মূর্খ এবং জনসাধারণ হচ্ছে চোর ও দুর্বৃত্ত, তাই মানব-সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় না হওয়ার ফলে, এই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সর্বত্র বিক্ষোভ, যুদ্ধ ও উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে।

শ্লোক ১৫

এবং দ্বিজাগ্র্যানুমতানুবৃত্ত-
ধর্মপ্রধানোঽন্যতমোঽবিতাস্যাঃ ।
হ্রস্বেন কালেন গৃহোপযাতান্
দ্রষ্টাসি সিদ্ধাননুরক্তলোকঃ ॥ ১৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণদের; **অগ্র্য**—অগ্রণীদের দ্বারা; **অনুমত**—অনুমোদিত; **অনুবৃত্ত**—গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত; **ধর্ম**—ধর্মনীতি; **প্রধানঃ**—যাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে; **অন্যতমঃ**—অনাসক্ত; **অবিতা**—রক্ষক; **অস্যাঃ**—পৃথিবীর; **হ্রস্বেন**—অল্প; **কালেন**—সময়ে; **গৃহ**—তোমার গৃহে; **উপযাতান্**—স্বয়ং এসে; **দ্রষ্টাসি**—তুমি দেখবে; **সিদ্ধান্**—সিদ্ধপুরুষ; **অনুরক্তঃ-লোকঃ**—প্রজাদের প্রিয়।

অনুবাদ

শ্রীবিষ্ণু বললেন—হে মহারাজ পৃথু! তুমি যদি গুরু-পরম্পরা ধারায় দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নির্দেশ অনুসারে প্রজা পালন কর, এবং সব রকম মনোধর্ম-প্রসূত মতবাদের প্রতি অনাসক্ত হয়ে, তাঁদের দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন পালন কর, তা হলে তোমার সমস্ত প্রজারা সুখী হবে এবং তারা তোমার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হবে, এবং তুমি অচিরেই সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার এই চারজন মুক্ত-পুরুষের দর্শন লাভ করবে।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু পৃথু মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসরণ করা; তা হলে, মানুষ এই জড় জগতে যে পরিস্থিতিতেই থাকুক না কেন, তার মৃত্যুর পর সে মুক্তি লাভ করবে। এই যুগে যেহেতু বর্ণাশ্রম ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে, তাই বর্ণাশ্রম ধর্মের সমস্ত নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এই যুগে জীবনের পূর্ণতা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি লাভ করা। বর্ণাশ্রম ধর্ম যেমন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন মানুষদের দ্বারা আচরণ করা সম্ভব, তেমনই পৃথিবীর প্রতিটি দেশের প্রতিটি মানুষের পক্ষে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা সম্ভব।

এখানে পরাশর, মনু আদি *দ্বিজাগ্র্য* বা ব্রাহ্মণ-প্রধানদের অনুসরণ করা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মনীতি অনুসারে জীবন যাপন করতে হয়, সেই সম্বন্ধে এই সমস্ত মহর্ষিরা ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল রূপ গোস্বামী আমাদের বিধি-বিধান দিয়েছেন। তাই গুরুশিষ্য পরম্পরার ধারায় যাঁরা দিব্য জ্ঞান লাভ করেছেন, সেই সমস্ত আচার্যদের নির্দেশ অনুসরণ করা কর্তব্য। এইভাবে, জীবনের বদ্ধ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, আমাদের বর্তমান স্থিতি পরিত্যাগ না করে, জড় কলুষের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন কারও অবস্থার পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই, কেবল পরম্পরা-সূত্র থেকে শ্রবণ করে এবং ব্যবহারিক জীবনে সেই সমস্ত নীতিগুলি অনুসরণ করে, জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—মুক্তিলাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেহের পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন চেতনার পরিবর্তন। দুর্ভাগ্যবশত, এই অধঃপতিত যুগে, মানুষেরা কেবল দেহের চিন্তাতেই মগ্ন, আত্মার চিন্তায় নয়। তারা কেবল দেহের পরিপ্রেক্ষিতে নানা মতবাদ

সৃষ্টি করেছে, আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।

আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্রের বহু প্রতিনিধিরা আইন-প্রণয়ন করার জন্য ভোট দিচ্ছে। প্রতিদিন তারা নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করছে। কিন্তু যেহেতু সেই সমস্ত আইনগুলি হচ্ছে কতকগুলি অনভিজ্ঞ বদ্ধ জীবের মনোধর্মী ধারণাপ্রসূত, তাই সেগুলি মানব-সমাজকে স্বস্তি প্রদান করতে পারে না। পূর্বে, রাজারা যদিও ছিলেন স্বৈরাচারী, তবুও তাঁরা মহর্ষি এবং মহাজনদের প্রদত্ত নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। তার ফলে রাজ্যশাসনে তাঁদের কোন রকম ভুল হত না, এবং সব কিছুই নিখুঁতভাবে পরিচালিত হত। প্রজারা তখন ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পুণ্যবান, রাজা ন্যায়সঙ্গতভাবে কর ধার্য করতেন, এবং তাই সেই পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সুখকর। বর্তমানে যে-সমস্ত তথাকথিত রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হচ্ছে, তারা সকলেই জড় বিষয়াসক্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, তারা কেবল তাদের নিজেদের স্বার্থের কথাই চিন্তা করে; তাদের কোন রকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানেরা এক-একটি মূর্খ এবং দুরাচারী, আর জনসাধারণ হচ্ছে শূদ্র। এই মূর্খ-দুরাচারী আর শূদ্রদের সমন্বয় কখনও পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে পারে না। তাই আমরা দেখতে পাই যে, মানব-সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও কলহ হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে, নেতারা কেবল মানুষকে মুক্তির পথে পরিচালিত করতেই অক্ষম নয়, তারা তাদের মানসিক শান্তি পর্যন্ত দিতে পারে না। *ভগবদ্গীতায়* তাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে যারা মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, তারা কখনও সফল হতে পারে না এবং মৃত্যুর পর সুখ অথবা মুক্তি লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ১৬

বরং চ মৎ কঞ্চন মানবেন্দ্র
বৃণীষ্ব তেঽহং গুণশীলযন্ত্রিতঃ ।
নাহং মখৈর্বৈ সুলভস্তপোভি-
র্যোগেন বা যৎসমচিত্তবর্তী ॥ ১৬ ॥

বরম্—বর; **চ**—ও; **মৎ**—আমার থেকে; **কঞ্চন**—তুমি যা চাও; **মানব-ইন্দ্র**—হে নরশ্রেষ্ঠ; **বৃণীষ্ব**—অনুরোধ কর; **তে**—তোমার; **অহম্**—আমি; **গুণ-শীল**—উত্তম গুণ এবং শ্রেষ্ঠ আচরণ দ্বারা; **যন্ত্রিতঃ**—মুগ্ধ হয়ে; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **মখৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **সু-লভঃ**—অনায়াসলব্ধ; **তপোভিঃ**—

তপস্যার দ্বারা; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **বা**—অথবা; **যৎ**—যার ফলে; **সমচিত্ত**—যার চিত্ত বৈষম্যরহিত; **বর্তী**—অবস্থিত হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্! তোমার উত্তম গুণাবলী এবং অপূর্ব সুন্দর আচরণে আমি মুগ্ধ হয়েছি, এবং তাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। সেই জন্য তুমি আমার কাছে যে-কোন বর প্রার্থনা করতে পার। যারা উচ্চগুণাবলী-সমন্বিত নয় এবং যাদের আচরণ উত্তম নয়, তারা কেবলমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, কঠোর তপস্যার দ্বারা অথবা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কখনও আমার কৃপা লাভ করতে পারে না। কিন্তু যাঁদের চিত্ত সমস্ত পরিস্থিতিতে বৈষম্য-রহিত, তাঁদের হৃদয়ে আমি সর্বদা বিরাজ করি।

তাৎপর্য

পৃথু মহারাজের সুন্দর চরিত্র ও আচরণে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে বরদান করেছিলেন। ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অথবা যোগ অভ্যাসের দ্বারা কখনও তাঁর প্রসন্নতা-বিধান করা যায় না। তিনি কেবল সৎ চরিত্র ও আচরণের দ্বারাই প্রসন্ন হন। কিন্তু মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত গুণগুলি বিকশিত করা যায় না। যারা ভগবানের প্রতি অবিচলিতভাবে শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ, তাঁরাই আত্মার সমস্ত সদ্‌গুণগুলি বিকশিত করতে পারে। আত্মা যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তা ভগবানের সদ্‌গুণ-সমন্বিত। আত্মা যখন জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত থাকে, তখনই কেবল জড় গুণাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ভাল অথবা মন্দের বিচার হয়ে থাকে। কিন্তু জীব যখন সমস্ত জড় গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়, তখন সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তার মধ্যে বিকশিত হয়। ভগবদ্ভক্তের মধ্যে যে ছাব্বিশটি গুণ দেখা যায়, সেগুলি হচ্ছে— (১) কৃপালু, (২) কারও সঙ্গে ঝগড়া না করা, (৩) পরম সত্যে অবিচল, (৪) সকলের প্রতি সমদর্শী, (৫) নির্দোষ, (৬) দানশীল, (৭) মৃদু, (৮) শুচি, (৯) সরল, (১০) পরোপকারী, (১১) শান্ত, (১২) কৃষ্ণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আসক্ত, (১৩) জড় বাসনা-রহিত, (১৪) বিনীত, (১৫) স্থির, (১৬) সংযত, (১৭) মিতাহারী, (১৮) অপ্রমত্ত, (১৯) মানদ, (২০) অমানী, (২১) গম্ভীর, (২২) করুণাপূর্ণ, (২৩) বন্ধু-ভাবাপন্ন, (২৪) কবি, (২৫) দক্ষ এবং (২৬) মৌনী। জীবের মধ্যে যখন এই সমস্ত দিব্য গুণ বিকশিত হয়, তখন ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, কৃত্রিমভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা যোগ

অভ্যাসের দ্বারা কখনও ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় না। অর্থাৎ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন না করলে, কেউ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আশা করতে পারে না।

শ্লোক ১৭

মৈত্রেয় উবাচ

স ইত্থং লোকগুরুণা বিষ্বক্সেনেন বিশ্বজিৎ ।
অনুশাসিত আদেশং শিরসা জগৃহে হরেঃ ॥ ১৭ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **সঃ**—তিনি; **ইত্থম্**—এইভাবে; **লোক-গুরুণা**—সমস্ত মানুষের পরম প্রভুর দ্বারা; **বিষ্বক্সেনেন**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **বিশ্ব-জিৎ**—বিশ্ববিজেতা (মহারাজ পৃথু); **অনুশাসিত**—আদিষ্ট হয়ে; **আদেশম্**—নির্দেশ; **শিরসা**—মস্তকে; **জগৃহে**—গ্রহণ করে; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! এইভাবে বিশ্বজিৎ মহারাজ পৃথু পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রত্যেকের ভগবানের আদেশ গ্রহণ করা উচিত। অর্থাৎ, পরমেশ্বর ভগবান যা বলেছেন তা ঠিক সেভাবেই, অত্যন্ত সাবধানতা ও শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের বাণীর সংশোধন করা অথবা সংযোজন করা আমাদের কার্য নয়, আজকাল তথাকথিত বহু পণ্ডিত ও স্বামী এইভাবে *ভগবদ্গীতার* মনগড়া ভাষ্য রচনা করছে। ভগবানের আদেশ কিভাবে গ্রহণ করতে হয় তার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত পৃথু মহারাজ এখানে দিয়েছেন। পরম্পরার মাধ্যমে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার এটিই হচ্ছে পন্থা।

শ্লোক ১৮

স্পৃশন্তং পাদয়োঃ প্রেম্না ব্রীড়িতং স্বেন কর্মণা ।
শতক্রতুং পরিষ্বজ্য বিদ্বেষং বিসসর্জ হ ॥ ১৮ ॥

স্পৃশন্তম্—স্পর্শ করে; **পাদয়োঃ**—পা; **প্রেম্না**—প্রেমবশত; **ব্রীড়িতম্**—লজ্জিত; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **কর্মণা**—কার্যকলাপের দ্বারা; **শত-ক্রতুম্**—দেবরাজ ইন্দ্র; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **বিদ্বেষম্**—বিদ্বেষ; **বিসসর্জ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; হ—নিঃসন্দেহে।

অনুবাদ

ইন্দ্র তখন তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে, পৃথু মহারাজের পদযুগলে পতিত হলেন। কিন্তু পৃথু মহারাজ তৎক্ষণাৎ প্রেমাপ্লুত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁর যজ্ঞাশ্ব অপহরণ-জনিত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অপরাধ করে তারপর অনুতপ্ত হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখানেও আমরা দেখতে পাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র এত শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে এসেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও, পৃথু মহারাজের যজ্ঞের অশ্ব চুরি করার জন্য, তিনি নিজেকে একজন মহা অপরাধী বলে মনে করেছিলেন। ভগবান কখনও বৈষ্ণব-অপরাধীকে ক্ষমা করেন না। তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। একজন মহান ঋষি ও যোগী দুর্বাসা মুনি অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করেছিলেন, এবং তাঁকেও অম্বরীষ মহারাজের পাদপদ্মে পতিত হতে হয়েছিল।

পৃথু মহারাজের পদতলে ইন্দ্র পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু পৃথু মহারাজ ছিলেন এমনই এক উদারচিত্ত বৈষ্ণব যে, তিনি চাননি ইন্দ্র তাঁর পদতলে পতিত হোন। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁকে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাঁরা দুজনেই পূর্বের ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও মহারাজ পৃথু উভয়েই পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা উভয়েই ছিলেন বৈষ্ণব বা শ্রীবিষ্ণুর সেবক, তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করেছিলেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে সহযোগিতামূলক আচরণের এটি একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বর্তমান সময়ে, মানুষেরা যেহেতু বৈষ্ণব নয়, তাই তারা পরস্পরের সঙ্গে সর্বক্ষণ যুদ্ধ করছে এবং তার ফলে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পূর্বেই বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এই পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করা অত্যন্ত প্রয়োজন, যাতে মানুষ পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও ঈর্ষাপরায়ণ হলেও, কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে এই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা ও মাৎসর্য পরিত্যাগ করতে পারে।

শ্লোক ১৯

ভগবানথ বিশ্বাত্মা পৃথুনোপহৃতার্হণঃ ।
সমুজ্জিহানয়া ভক্ত্যা গৃহীতচরণাম্বুজঃ ॥ ১৯ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অথ**—তার পর; **বিশ্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **পৃথুনা**—পৃথু মহারাজের দ্বারা; **উপহৃত**—নিবেদিত; **অর্হণঃ**—পূজার সমস্ত সামগ্রী; **সমুজ্জিহানয়া**—ক্রমশ বর্ধিত; **ভক্ত্যা**—যার ভক্তি; **গৃহীত**—গ্রহণ করে; **চরণ-অম্বুজঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম অত্যন্ত সুন্দরভাবে পূজা করেছিলেন। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পূজা করার সময়, পৃথু মহারাজের ভগবৎ-প্রেম ক্রমশ বর্ধিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভক্তের শরীরে যখন বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদয় হয়, তখন বুঝতে হবে যে, তাঁর ভক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। ক্রন্দন, হাস্য, স্বেদ, মূর্চ্ছা, উন্মাদনা ইত্যাদি বহু প্রকার দিব্য ভাব রয়েছে। এই সমস্ত লক্ষণগুলি কখনও কখনও ভক্তের শরীরে দেখা যায়। তাদের বলা হয় অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার, অর্থাৎ 'আট প্রকার দিব্য রূপান্তর'। সেগুলির কখনও অনুকরণ করা উচিত নয়, কিন্তু ভক্ত যখন সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই সমস্ত লক্ষণগুলি আপনা থেকেই তাঁর শরীরে প্রকাশিত হয়। ভগবান হচ্ছেন ভক্ত-বৎসল, অর্থাৎ তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। তাই ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে-দিব্য আনন্দময় আদান প্রদান হয়, তা এই জড় জগতের কার্যকলাপের মতো নয়।

শ্লোক ২০

প্রস্থানাভিমুখোঽপ্যেনমনুগ্রহবিলম্বিতঃ ।
পশ্যন্ পদ্মপলাশাক্ষো ন প্রতস্থে সুহৃৎসতাম্ ॥ ২০ ॥

প্রস্থান—প্রস্থান করতে; **অভিমুখঃ**—উদ্যত; **অপি**—যদিও; **এনম্**—তাঁকে (পৃথুকে); **অনুগ্রহ**—দয়া দ্বারা; **বিলম্বিতঃ**—বিলম্ব; **পশ্যন্**—দেখে; **পদ্ম-পলাশ-অক্ষঃ**—

ভগবান, যাঁর নয়ন কমলদলের মতো; **ন**—না; **প্রতস্থে**—প্রস্থান করেছিলেন; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **সতাম্**—ভক্তদের।

অনুবাদ

ভগবান তখন প্রস্থান করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি পৃথু মহারাজের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ-পরায়ণ ছিলেন, তাই তিনি প্রস্থান করতে পারলেন না। ভগবান তখন তাঁর কমল-নয়নের দ্বারা পৃথু মহারাজের আচরণ দর্শন করেছিলেন, ভক্ত-বাৎসল্যহেতু তাঁর এই বিলম্ব হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে *সুহৃৎ সতাম্* শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত হন এবং তিনি সর্বদাই তাঁদের শুভ কামনা করেন। এটি পক্ষপাতিত্ব নয়। *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন *(সমোঽহং সর্ব-ভূতেষু)*, কিন্তু যিনি তাঁর সেবায় যুক্ত, তাঁর প্রতি তিনি অনুগ্রহশীল। আর এক জায়গায় ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ভক্ত সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং তিনিও সর্বদা তাঁর ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

তাঁর শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের এই অনুরাগ অস্বাভাবিক নয়, অথবা পক্ষপাতিত্ব নয়। যেমন, পিতা তাঁর বহু পুত্রের মধ্যে যেই পুত্রটি তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, তার প্রতি তিনিও বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১০/১০) তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যাঁরা নিরন্তর প্রীতি ও অনুরাগ সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থিত ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভগবান তাঁর ভক্তদের থেকে দূরে থাকেন না। তিনি সর্বদাই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তাঁর ভক্তই কেবল তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। তাই, ভগবদ্ভক্তের কখনও ভুল করার সম্ভাবনা থাকে না, এবং ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে পক্ষপাতিত্ব করেন না।

শ্লোক ২১

স আদিরাজো রচিতাঞ্জলির্হরিং
বিলোকিতুং নাশকদশ্রুলোচনঃ ।
ন কিঞ্চনোবাচ স বাষ্পবিক্লবো
হৃদোপগুহ্যামুমধাদবস্থিতঃ ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি; **আদি-রাজঃ**—আদি রাজা; **রচিত-অঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বিলোকিতুম্**—দেখার জন্য; **ন**—না; **অশকৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **অশ্রু-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **ন**—না; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **উবাচ**—বলেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **বাষ্প-বিক্লবঃ**—তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল; **হৃদা**—হৃদয়ে; **উপগুহ্য**—আলিঙ্গন করে; **অমুম্**—ভগবান; **অধাৎ**—অবস্থান করেছিলেন; **অবস্থিতঃ**—দাঁড়িয়ে ছিলেন।

অনুবাদ

আদি রাজা পৃথুর চক্ষু তখন অশ্রুপূর্ণ হওয়ায় এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায়, ভগবানকে দর্শন করতে পারলেন না এবং তাঁকে সম্ভাষণ করতে পারলেন না। তিনি কেবল তাঁর হৃদয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে, কৃতাঞ্জলিপুটে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় যেমন শ্রীকৃষ্ণকে আদি পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনই, ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার হওয়ার ফলে, পৃথু মহারাজকে এই শ্লোকে *আদিরাজ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং একজন মহান বীর। তিনি তাঁর রাজ্যে সমস্ত দুষ্টদের দমন করেছিলেন। তিনি এতই শক্তিশালী ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি সক্ষম ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের পুণ্যকর্মে ও ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত রেখে, তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন। প্রজাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা না করে, তিনি একটি কড়ি পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে কর হিসাবে গ্রহণ করেননি। জীবনের সব চাইতে বড় বিপত্তি হচ্ছে ভগবদ্বিহীন হওয়া এবং তাই তা পাপময়। যদি রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা প্রজাদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আসবপান, আমিষাহার ও দ্যূতক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে পাপ কর্ম করতে দেন, তা হলে রাজা সেই জন্য দায়ী হন, এবং প্রজাদের সেই সমস্ত পাপকর্মের ফল রাজাকে ভোগ করতে হয়, কারণ তিনি অনর্থক তাদের কাছ থেকে কর

সংগ্রহ করেন। শাসকদের জন্য নিয়মাবলী রয়েছে, এবং যেহেতু শাসক-প্রধানরূপে পৃথু মহারাজ সেই সমস্ত নিয়মগুলি পালন করেছিলেন, তাই তাঁকে এখানে *আদিরাজঃ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

মহারাজ পৃথুর মতো একজন দায়িত্বশীল রাজাও প্রথম শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্ত হতে পারেন। পৃথু মহারাজের আচরণ থেকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, কিভাবে তিনি অন্তরে ও বাইরে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির আনন্দ অনুভব করেছিলেন।

আজকে বোম্বাইয়ের খবর কাগজে আমরা দেখলাম যে, সরকার মদ্যপান নিষেধের আইন তুলে নিচ্ছে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে বোম্বাইয়ে মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাগরিকেরা এতই ধূর্ত যে, তারা অবৈধভাবে মদ তৈরি করে, এবং খোলাখুলিভাবে দোকানে বিক্রি হতে না দিলেও, শৌচাগার তথা অন্যান্য অস্বাভাবিক স্থানে মদ বিক্রি করছে। এই প্রকার অবৈধ চোরাচালান বন্ধ করতে না পেরে, সরকার সস্তা দামে মদ তৈরি করতে স্থির করেছে, যাতে শৌচালয়ে মদ না কিনে, সরাসরিভাবে সরকারের কাছ থেকে তা কিনতে পারে। রাষ্ট্রসরকার পাপপূর্ণ জীবন থেকে নাগরিকদের হৃদয় পরিবর্তন সাধনে অকৃতকার্য হয়েছে, তাই তারা রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য এবং কর সংগ্রহে ক্ষতি হতে না দেওয়ার জন্য মদ তৈরি করে তা নাগরিকদের কাছে সরবরাহ করতে স্থির করেছে।

এই প্রকার সরকার কখনও পাপকর্মের ফল অর্থাৎ যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপদ প্রতিহত করতে পারে না। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে যে, ভগবানের আইন যখন অমান্য করা হয় (*ভগবদ্গীতায়* যাকে *ধর্মস্য গ্লানিঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে), তখন হঠাৎ যুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তাদের কঠোর দণ্ডভোগ করতে হয়। সম্প্রতি আমরা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ হতে দেখেছি। চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রচুর ধন ও জন নষ্ট হয়েছে, এবং সারা পৃথিবী জুড়ে উৎপাত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে পাপপূর্ণ জীবনের ফল। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষদের শুদ্ধ ও পবিত্র করা। আমরা যদি কৃষ্ণভাবনার বিকাশের ফলে আংশিকভাবেও শুদ্ধ হই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলা হয়েছে *নষ্ট-প্রায়েষু অভদ্রেষু*, তা হলে মানুষের কাম, ক্রোধ আদি ভবরোগ নিরাময় হবে। তা সম্ভব হতে পারে কেবল *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী বা কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করার মাধ্যমে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগ সামরিক তহবিলে কোটি কোটি টাকা দান করেছে, এবং সেই টাকাগুলিকে বারুদরূপে পোড়ানো হয়েছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তাদের যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য মুক্তহস্তে দান

করতে বলা হয়, তখন তারা নারাজ হয়। এই অবস্থায়, সারা পৃথিবী নানা প্রকার বিপর্যয় ও যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দুর্দশা ভোগ করবে। এটি হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করার পরিণতি।

শ্লোক ২২

অথাবমৃজ্যাশ্রুকলা বিলোকয়ন্-
নতৃপ্তদৃগ্‌গোচরমাহ পূরুষম্ ।
পদা স্পৃশন্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে
বিন্যস্তহস্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ ॥ ২২ ॥

অথ—তার পর; **অবমৃজ্য**—মার্জন করে; **অশ্রু-কলাঃ**—অশ্রুবিন্দু; **বিলোকয়ন্**—দর্শন করে; **অতৃপ্ত**—অপরিতৃপ্ত; **দৃক্-গোচরম্**—দৃষ্টির গোচরীভূত; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **পূরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **পদা**—তাঁর চরণকমল দ্বারা; **স্পৃশন্তম্**—স্পর্শ করে; **ক্ষিতিম্**—পৃথিবী; **অংসে**—স্কন্ধে; **উন্নতে**—উন্নত; **বিন্যস্ত**—স্থাপন করে; **হস্ত**—তাঁর হাতের; **অগ্রম্**—অগ্রভাগ; **উরঙ্গ-বিদ্বিষঃ**—সর্পশত্রু গরুড়ের।

অনুবাদ

তার পর তিনি অশ্রুধারা মার্জন করে দেখতে পেলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে, গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করে, তাঁর অপরিতৃপ্ত নয়ন-পথের পথিকরূপে অবস্থান করছেন। তখন পৃথু মহারাজ তাঁকে সম্বোধন করে এই প্রার্থনাটি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে যে, ভগবান পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে স্বর্গলোক পর্যন্ত সমস্ত উচ্চলোকের অধিবাসীরা পারমার্থিক জীবনে এত উন্নত যে, তাঁরা যখন এই পৃথিবী অথবা অনুরূপ অন্যান্য লোকে আসেন, তখন তাঁরা তাঁদের ভারশূন্যতা এমনভাবে বজায় রাখেন যে, ভূমি স্পর্শ না করেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু যেহেতু তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের একটি লোকে বাস করেন, তাই তিনি কখনও কখনও এমনভাবে অভিনয় করেন, যেন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন দেবতা। তিনি যখন প্রথম পৃথু মহারাজের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন,

তখন তিনি এই পৃথিবীর ভূমি স্পর্শ করেননি, কিন্তু তিনি যখন পৃথু মহারাজের আচরণ এবং চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হয়েছিলেন, তখন তিনি বৈকুণ্ঠলোকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণরূপে আচরণ করেছিলেন। পৃথু মহারাজের প্রতি তাঁর স্নেহের বশে, তিনি পৃথিবী স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বাহন গরুড়ের উন্নত স্কন্ধে তাঁর হস্তের অগ্রভাগ স্থাপন করেছিলেন, যেন পৃথিবীপৃষ্ঠে দাঁড়াতে অভ্যস্ত না হওয়ার ফলে পড়ে যেতে পারেন বলে, সেই অবলম্বন গ্রহণ করেছিলেন। এগুলি পৃথু মহারাজের প্রতি তাঁর গভীর স্নেহের লক্ষণ। তাঁর এই পরম সৌভাগ্য দর্শন করে, পৃথু মহারাজের নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হয়েছিল, এবং তাই তিনি স্পষ্টভাবে ভগবানকে দর্শন করতে পারেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও গদ্‌গদ স্বরে তিনি তাঁর বন্দনা করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

পৃথুরুবাচ

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্ বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্ ।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥ ২৩ ॥

পৃথুঃ উবাচ—পৃথু মহারাজ বললেন; **বরান্**—বর; **বিভো**—হে ভগবান; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **বর-দ-ঈশ্বরাৎ**—সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **বুধঃ**—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; **কথম্**—কিভাবে; **বৃণীতে**—প্রার্থনা করতে পারে; **গুণ-বিক্রিয়া**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন; **আত্মনাম্**—জীবের; **যে**—যে; **নারকাণাম্**—নরকবাসী জীবদের; **অপি**—ও; **সন্তি**—রয়েছে; **দেহিনাম্**—দেহধারীদের; **তান্**—সেই সমস্ত; **ঈশঃ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **কৈবল্য-পতে**—হে ব্রহ্মসাযুজ্য প্রদাতা; **বৃণে**—আমি প্রার্থনা করি; **ন**—না; **চ**—ও।

অনুবাদ

হে ভগবান! যাঁদের বরদান করার ক্ষমতা রয়েছে, আপনি সেই দেবতাদেরও ঈশ্বর। অতএব কোন বিবেকী ব্যক্তি কেন আপনার কাছে জড় জগতের গুণের বন্ধনে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভোগ্য বর প্রার্থনা করবে? সেই সমস্ত বর নরকবাসী

জীবেরা পর্যন্ত আপনা থেকে লাভ করে। হে ভগবান! আপনি ব্রহ্ম-সাযুজ্যও অবশ্যই দান করতে পারেন, কিন্তু সেই সমস্ত বর আমি লাভ করতে ইচ্ছা করি না।

তাৎপর্য

মানুষের বাসনা অনুসারে বিভিন্ন প্রকার বর রয়েছে। কর্মীদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ বর হচ্ছে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া। সেখানকার আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সুখের মাত্রা অত্যন্ত উন্নত। জ্ঞানী ও যোগীরা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চায়। তাকে বলা হয় *কৈবল্য* । তাই ভগবানকে এখানে *কৈবল্যপতি* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু ভগবানের কাছ থেকে ভগবদ্ভক্তরা এক ভিন্ন প্রকার বর প্রাপ্ত হন। ভক্তরা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চান না অথবা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যেতে চান না। ভক্তদের কাছে *কৈবল্য* ও নরকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যারা এই জড় জগতে রয়েছে, তাদের বলা হয় নারকী কারণ এই জড় জগৎ নারকীয়। পৃথু মহারাজ বলেছেন যে, তিনি কর্মীদের অভীপ্সিত বর কামনা করেন না, এমন কি জ্ঞানী ও যোগীদের অভীপ্সিত বরও কামনা করেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বর্ণনা করেছেন যে, *কৈবল্য* নরক-সদৃশ, এবং স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুমের মতো। ভক্ত সেগুলি কামনা করেন না। ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মা অথবা শিবের পদও কামনা করেন না, এমন কি ভক্ত ভগবানের সমানও হতে চান না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরূপে পৃথু মহারাজ তাঁর স্থিতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ২৪

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিন্-
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥ ২৪ ॥

ন—না; **কাময়ে**—কামনা করি; **নাথ**—হে প্রভু; **তৎ**—তা; **অপি**—এমন কি; **অহম্**—আমি; **ক্বচিৎ**—কখনও; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **যুষ্মৎ**—আপনার; **চরণ-অম্বুজ**—শ্রীপাদপদ্মের; **আসবঃ**—অমৃত; **মহৎ-তম**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের; **অন্তঃ-হৃদয়াৎ**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে; **মুখ**—মুখ থেকে; **চ্যুতঃ**—নির্গত;

বিধৎস্ব—প্রদান করুন; **কর্ণ**—কান; **অযুতম্**—দশ সহস্র; **এষঃ**—এই; **মে**—আমার; **বরঃ**—বর।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমি তাই আপনার অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার বর প্রার্থনা করি না, কারণ সেই অস্তিত্বে আপনার শ্রীপাদপদ্মের অমৃত পান করা যায় না। আমি কেবল অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করি, কারণ তার ফলে আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখ থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করতে সক্ষম হব।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে পৃথু মহারাজ ভগবানকে *কৈবল্যপতি* বলে সম্বোধন করেছেন। তার মানে এই নয় যে, তিনি কৈবল্য মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তা এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—"হে প্রভু! আমি সেই প্রকার বর কামনা করি না।" পৃথু মহারাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করার জন্য অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ভগবানের সেই মহিমা যেন তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের শ্রীমুখনিঃসৃত হয়, যাঁরা তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভগবানের সেই মহিমা কীর্তন করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে (১/১/৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *শুক-মুখাদ্ অমৃত-দ্রব-সংযুতম্*—শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়ার ফলে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* অমৃত আরও অধিক আস্বাদনীয় হয়েছে। কেউ মনে করতে পারে যে, ভক্ত ও অভক্ত নির্বিশেষে যে-কোন মানুষের কাছ থেকে অথবা যে-কোন স্থানে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা যেতে পারে, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের মহিমা যেন অবশ্যই শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়। অভক্তদের মুখ থেকে শ্রবণ করতে শ্রীল সনাতন গোস্বামী কঠোরভাবে নিষেধ করে গেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বহু পেশাদারী বক্তা রয়েছে, যারা অত্যন্ত আলঙ্কারিক ঢঙে *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রবচন দেয়, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত তাদের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শুনতে চান না, কারণ ভগবানের এই প্রকার মহিমা-কীর্তন কেবল জড় শব্দ-তরঙ্গের স্পন্দন মাত্র। কিন্তু যখন এই *শ্রীমদ্ভাগবত* শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা হয়, তখন ভগবানের মহিমা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী (৩/২৫/২৫) *সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্যসংবিদ* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে যখন ভগবানের মহিমা কীর্তিত হয়, তখন

তা অত্যন্ত বীর্যবতী হয়। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভগবানের অসংখ্য ভক্ত রয়েছে, এবং তাঁরা অনাদিকাল ধরে অন্তহীনভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে শেষ করতে পারছেন না। পৃথু মহারাজ তাই অযুত কর্ণ লাভের বর প্রার্থনা করেছেন, ঠিক যেমন রূপ গোস্বামীও কোটি কোটি কর্ণ ও কোটি কোটি জিহ্বা লাভের বাসনা করেছেন, যাতে তিনি ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারেন এবং শ্রবণ করতে পারেন। অর্থাৎ, আমাদের কর্ণ যদি সর্বদা ভগবানের মহিমা শ্রবণে যুক্ত থাকে, তা হলে পারমার্থিক উন্নতির সর্বনাশ সাধনকারী মায়াবাদ দর্শন শ্রবণ করার কোন অবকাশ থাকবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, কেউ যদি মায়াবাদীর কাছ থেকে ভগবানের কার্যকলাপের বিষয় শ্রবণ করে, তা হলে সেই বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্র থেকে হলেও তার সর্বনাশ হবে। মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করে কেউই পারমার্থিক জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না।

শ্লোক ২৫

স উত্তমশ্লোক মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

সঃ—সেই; **উত্তম-শ্লোক**—উত্তমশ্লোকের দ্বারা যাঁর বন্দনা হয়, সেই ভগবান; **মহৎ**—মহান ভক্তদের; **মুখ-চ্যুতঃ**—মুখনিঃসৃত; **ভবৎ**—আপনার; **পদ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম থেকে; **সুধা**—অমৃতের; **কণ**—বিন্দু; **অনিলঃ**—সুখকর বায়ু; **স্মৃতিম্**—স্মরণশক্তি; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিস্মৃত**—বিস্মৃত; **তত্ত্ব**—সত্য; **বর্ত্মনাম্**—যাদের পথ; **কু-যোগিনাম্**—যারা ভগবদ্ভক্তির পন্থা গ্রহণ করেনি তাদের; **নঃ**—আমাদের; **বিতরতি**—পুনরায় প্রদান করে; **অলম্**—বৃথা; **বরৈঃ**—অন্য বর।

অনুবাদ

হে ভগবান! মহাপুরুষদের মুখনিঃসৃত উত্তমশ্লোকের দ্বারা আপনার মহিমা কীর্তিত হয়। আপনার শ্রীপাদপদ্মের এই মহিমা ঠিক কেশরের কণার মতো। যখন মহান ভক্তদের মুখনিঃসৃত বাণী আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিসদৃশ কেশরের সৌরভ

বহন করে, তখন বিস্মৃত জীবেরা পুনরায় আপনার সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করে। এইভাবে ভক্তরা যথাযথভাবে জীবনের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। হে ভগবান, আমি আপনার শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে আপনার মহিমা শ্রবণ করার সৌভাগ্য ব্যতীত আর অন্য কোন বর চাই না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা উচিত। সেই কথা পুনরায় এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তের মুখনিঃসৃত চিন্ময় শব্দতরঙ্গ এতই বীর্যবতী যে, তা ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের স্মৃতি পুনর্জাগরিত করতে পারে। এই জগতে মায়ার বশীভূত হওয়ার ফলে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আমরা বিস্মৃত হয়েছি, ঠিক যেমন গভীর নিদ্রায় মগ্ন মানুষ তার কর্তব্য ভুলে যায়। *বেদে* বলা হয়েছে যে, আমরা সকলে মায়ার প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছি। এই নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে উঠে, আমাদের প্রকৃত সেবায় যুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য, এবং এইভাবে আমরা এই মনুষ্য জীবনের অপূর্ব সুযোগ যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার করতে পারি। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একটি গানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, জীব জাগ, জীব জাগ। ভগবান প্রতিটি জীবকে জেগে উঠে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন, যাতে এই মনুষ্য-জীবনে তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। জেগে ওঠার এই বাণী শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়।

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন, তাই তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কেশর-সদৃশ কৃপাকণার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত। শুদ্ধ ভক্তের বাণী যদিও জড় আকাশের শব্দেরই মতো, তবুও তাঁর সেই বাণী এমনই বীর্যবতী যে, তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কেশরকণা স্পর্শ করে। কোন নিদ্রিত ব্যক্তি যখন শুদ্ধ ভক্তের মুখনিঃসৃত বীর্যবতী বাণী শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা মনে পড়ে যায়, যদিও সেই ক্ষণ পর্যন্ত সে সব কিছু ভুলে ছিল।

তাই সকাম কর্ম, মনোধর্মী জ্ঞান অথবা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে বদ্ধ জীবদের শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই হচ্ছি *কুযোগী,* কারণ ভগবানের নিত্য সেবকরূপে তাঁর সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, আমরা এই জড় জগতের সেবায় যুক্ত হয়েছি। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই

কুযোগীর স্তর থেকে সুযোগীর স্তরে উন্নীত হওয়া। শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করার পন্থা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে, বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশেষভাবে অনুমোদন করেছেন। মানুষ তার নিজের অবস্থাতেই থাকতে পারেন—তা যে অবস্থাতেই হোক না কেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করার ফলে, তিনি ধীরে ধীরে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁরা প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। এইভাবে জীবন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হতে পারে। তাই, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করার এই পন্থা পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৬

যশঃ শিবং সুশ্রব আর্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎপ্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥

যশঃ—মহিমা; **শিবম্**—কল্যাণকর; **সু-শ্রবঃ**—হে মহা-মহিমান্বিত ভগবান; **আর্য-সঙ্গমে**—উত্তম ভক্তদের সাহচর্যে; **যদৃচ্ছয়া**—কোন না কোনভাবে; **চ**—ও; **উপশৃণোতি**—শ্রবণ করেন; **তে**—আপনার; **সকৃৎ**—একবারও; **কথম্**—কিভাবে; **গুণ-জ্ঞঃ**—গুণগ্রাহী; **বিরমেৎ**—বিরত হতে পারে; **বিনা**—যদি না; **পশুম্**—পশু; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **যৎ**—যা; **প্রবব্রে**—স্বীকৃত; **গুণ**—আপনার গুণের; **সংগ্রহ**—লাভ করার; **ইচ্ছয়া**—ইচ্ছায়।

অনুবাদ

হে মহা-মহিমান্বিত ভগবান! কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের সাহচর্যে আপনার কার্যকলাপের মহিমা একবারও শ্রবণ করেন, এবং তিনি যদি একটি পশু না হন, তা হলে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা কখনও করবে না। আপনার মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনের পূর্ণপন্থা লক্ষ্মীদেবীও গ্রহণ করেছেন। তিনি কেবল আপনার অনন্ত কার্যকলাপ ও অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ করার জন্য সর্বদা উৎসুক।

তাৎপর্য

এই সংসারে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ *(আর্য-সঙ্গম)* সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। *আর্য* শব্দটির অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক মার্গে যাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন। মানব-জাতির ইতিহাসে, আর্যদের পৃথিবীর সব চাইতে উন্নত জাতি বলে বিবেচনা করা হয়েছে, কারণ তাঁরা বৈদিক সভ্যতা গ্রহণ করেছেন। আর্যরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন এবং তাঁরা ভারতীয়-আর্য নামে পরিচিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমস্ত আর্যরা সমস্ত বৈদিক নিয়ম পালন করতেন, এবং তার ফলে তাঁরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত ছিলেন। রাজর্ষি নামে পরিচিত রাজারা ক্ষত্রিয়রূপে অথবা প্রজাদের রক্ষা-কর্তারূপে এত সুন্দর শিক্ষালাভ করতেন, এবং আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁরা এত উন্নত ছিলেন যে, প্রজাদের লেশমাত্রও কষ্ট ছিল না।

আর্যরা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। অন্যদের ক্ষেত্রে যদিও কোন বাধা ছিল না, তবুও আর্যরা অতি শীঘ্রই পারমার্থিক জীবনের সার গ্রহণ করতে পারতেন। ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের কাছে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের বাণী এত সহজে প্রচার করতে পারছি কি করে? ইতিহাস বলে যে, আমেরিকান ও ইউরোপীয়রা যখন উপনিবেশ স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিল, তখন তারা তাদের যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু বর্তমানে জড় বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাবে কলুষিত হয়ে, তাদের পুত্র ও পৌত্রেরা দুরাচারী হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে তারা তাদের আদি আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি, বৈদিক সভ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে আর্য পরিবারের এই সমস্ত বংশধরেরা অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করছে। অন্যেরা যারা তাদের সঙ্গ করছে, এবং শুদ্ধ ভক্তদের মুখ থেকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তন করছে, তারাও এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আর্যদের সঙ্গে যখন এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গ উচ্চারণ করা হয়, তখন তার প্রভাব অত্যন্ত বীর্যবতী হয়; তবে আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত না হলেও, কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ করেন, তা হলে তিনিও বৈষ্ণবে পরিণত হবেন, কারণ এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের মহতী প্রভাব সকলকেই প্রভাবিত করে।

পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, নারায়ণের নিত্যসঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের মহিমা শ্রবণ করতে চান, এবং ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ব্রজগোপিকাদের সঙ্গ লাভের জন্য লক্ষ্মীদেবী কঠোর তপস্যা করেছিলেন। নির্বিশেষবাদীরা প্রশ্ন করতে পারে, কৈবল্য বা মুক্তি অথবা ভগবানের অস্তিত্বে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে, বহু বছর ধরে নিরন্তর কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে কি লাভ হবে। তার

উত্তরে পৃথু মহারাজ বলেছেন যে, এই কীর্তনের আকর্ষণ এমনই মহৎ যে, কেউ যদি নিছক একটি পশু না হয়, তা হলে তার পক্ষে এই পন্থা পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এমন কি কেউ যদি ঘটনাক্রমেও এই দিব্য শব্দ-তরঙ্গের সান্নিধ্য লাভ করে, তা হলে তার ক্ষেত্রেও তাই হয়। এই বিষয়ে পৃথু মহারাজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, একটি পশুই কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের অনুশীলন ত্যাগ করতে পারে। যাঁরা পশু নয়, পক্ষান্তরে প্রকৃতই বুদ্ধিমান, উন্নত, সভ্য মানুষ, তাঁরা কখনও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ত্যাগ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

অথাভজে ত্বাখিলপূরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎকৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥ ২৭ ॥

অথ—অতএব; **আভজে**—আমি ভজনা করব; **ত্বা**—আপনাকে; **অখিল**—সমস্ত; **পূরুষ-উত্তমম্**—শ্রীভগবান; **গুণ-আলয়ম্**—সমস্ত সদ্‌গুণের আধার; **পদ্ম-করা**—পদ্মহস্ত লক্ষ্মীদেবী; **ইব**—সদৃশ; **লালসঃ**—ইচ্ছুক; **অপি**—বাস্তবিকপক্ষে; **আবয়োঃ**—লক্ষ্মীদেবী ও আমার; **এক-পতি**—এক পতি; **স্পৃধোঃ**—প্রতিযোগিতা; **কলিঃ**—কলহ; **ন**—না; **স্যাৎ**—হতে পারে; **কৃত**—করে; **ত্বৎ-চরণ**—আপনার শ্রীপাদপদ্ম; **এক-তানয়োঃ**—একাগ্রতা।

অনুবাদ

এখন আমি ঠিক কমলার মতো ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে চাই, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণের আধার। সেই জন্য হয়তো লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আমার বিবাদ হতে পারে, কারণ আমরা উভয়েই একাগ্রচিত্তে একই সেবায় যুক্ত হব।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে *অখিল-পূরুষোত্তম* বলে সম্বোধন করা হয়েছে, কারণ ভগবান হচ্ছেন সমগ্র জগতের ঈশ্বর। *পুরুষ* মানে হচ্ছে 'ভোক্তা' এবং উত্তম মানে হচ্ছে

'শ্রেষ্ঠ'। এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন প্রকার *পুরুষ* বা ভোক্তা রয়েছে। সাধারণত তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য। *বেদে* ভগবানকে সমস্ত নিত্যের মধ্যে পরম নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে *(নিত্যো নিত্যানাম্)*। পরমেশ্বর ভগবান ও জীব উভয়েই নিত্য। পরম নিত্য হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব, বা বিষ্ণু ও তাঁর অবতারেরা। অতএব নিত্য বলতে কৃষ্ণ থেকে শুরু করে মহাবিষ্ণু, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য অবতারদের ইঙ্গিত করে। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে *(রামাদি-মূর্তিষু)*, রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি ভগবান বিষ্ণুর অনন্ত কোটি অবতার রয়েছেন, এবং তাঁদের সকলকেই বলা হয় নিত্য।

যাঁরা কখনও এই জড় জগতে আসেননি, মুক্ত শব্দটি সেই সমস্ত জীবেদের ইঙ্গিত করে। বদ্ধ জীব হচ্ছে তারা, যারা প্রায় নিত্যকাল ধরে এই জড় জগতে রয়েছে। বদ্ধরা জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে, আনন্দ লাভ করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে, কিন্তু মুক্তরা ইতিমধ্যেই বন্ধনমুক্ত। তাঁরা কখনও এই জড় জগতে আসেন না। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন এই জড় জগতের অধীশ্বর, এবং জড়া প্রকৃতির দ্বারা তাঁর নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই শ্রীবিষ্ণুকে এখানে *পুরুষোত্তম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে জীবতত্ত্বের তুলনা করা অথবা তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা একটি মহা অপরাধ। মায়াবাদীরা জীব ও ভগবানকে সমান ও এক বলে মনে করে। সেটি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ ।

এই জড় জগতে আমরা দেখতে পাই যে, উন্নত স্তরের ব্যক্তি নিকৃষ্ট স্তরের দ্বারা পূজিত হন। তেমনই, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীবিষ্ণু সর্বদাই অন্যদের দ্বারা পূজিত হন। পৃথু মহারাজ তাই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হতে মনস্থ করেছেন। পৃথু মহারাজকে শ্রীবিষ্ণুর একজন অবতার বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তিনি হচ্ছেন শক্ত্যাবেশ অবতার। এই শ্লোকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *গুণালয়ম্*, যা ইঙ্গিত করে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত গুণের উৎস। মায়াবাদীরা তাদের নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্গুণ (সমস্ত গুণরহিত), কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত গুণের উৎস। ভগবানের সব চাইতে মাহাত্ম্যপূর্ণ একটি গুণ হচ্ছে তাঁর ভক্তদের প্রতি তাঁর অনুরাগ, তাই তাঁকে বলা হয় ভক্তবৎসল। ভক্তরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় আগ্রহী, এবং ভগবানও তাঁর ভক্তদের প্রেমময়ী সেবা গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী। এই সেবার বিনিময়ে নানা প্রকার দিব্য আদান-প্রদান হয়, যাদের বলা হয় দিব্য গুণাত্মক

কার্যকলাপ। ভগবানের দিব্য গুণাবলীর কয়েকটি হচ্ছে যে, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপ্ত, সর্ব-শক্তিমান, সর্ব-কারণের পরম কারণ, পরম সত্য, সমস্ত আনন্দের উৎস, সমস্ত জ্ঞানের উৎস, সর্ব-মঙ্গলময়, ইত্যাদি।

লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পৃথু মহারাজ ভগবানের সেবা করার বাসনা করেছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি মাধুর্যরসে অবস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীদেবী মাধুর্য রসে ভগবানের সেবায় যুক্ত। যদিও লক্ষ্মীদেবীর স্থান ভগবানের বক্ষে, কিন্তু একজন ভক্তরূপে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করে আনন্দ উপভোগ করেন। পৃথু মহারাজ কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথাই চিন্তা করছিলেন, কারণ তিনি ভগবানের দাস্যরসের সেবক। পরবর্তী শ্লোকে আমরা জানতে পারব যে, পৃথু মহারাজ লক্ষ্মীদেবীকে জগজ্জননীরূপে দর্শন করছিলেন। তার ফলে মাধুর্যরসে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শঙ্কিত ছিলেন যে, ভগবানের সেবা করার ফলে, লক্ষ্মীদেবী হয়তো তাঁর প্রতি রুষ্ট হতে পারেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, চিন্ময় জগতেও ভগবানের সেবকদের মধ্যে সেবার প্রতিযোগিতা হয়, কিন্তু এই প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণরূপে দ্বেষভাব-রহিত। বৈকুণ্ঠলোকে যদি কোন ভক্ত ভগবানের সেবায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, তা হলে অন্যেরা তাঁর শ্রেষ্ঠ সেবার জন্য ঈর্ষান্বিত হন না, বরং সেই সেবার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার প্রয়াসী হন।

শ্লোক ২৮

জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্মণি নঃ সমীহিতম্ ।
করোষি ফল্ব্যপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥ ২৮ ॥

জগৎ-জনন্যাম্—জগজ্জননী লক্ষ্মীদেবী; **জগৎ-ঈশ**—হে জগদীশ্বর; **বৈশসম্**—ক্রোধ; **স্যাৎ**—হতে পারে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ-কর্মণি**—যাঁর কার্যকলাপে; **নঃ**—আমার; **সমীহিতম্**—আকাঙ্ক্ষা; **করোষি**—আপনি বিবেচনা করুন; **ফল্গু**—তুচ্ছ সেবা; **অপি**—যদিও; **উরু**—অত্যধিক; **দীন-বৎসলঃ**—দীনের প্রতি স্নেহপরায়ণ; **স্বে**—নিজের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধিষ্ণ্যে**—আপনার ঐশ্বর্যে; **অভিরতস্য**—সম্পূর্ণরূপে যিনি সন্তুষ্ট; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **তয়া**—তাঁর সঙ্গে।

অনুবাদ

হে জগদীশ্বর! লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন সারা জগতের মাতা, এবং তবু আমার মনে হয় যে, তাঁর সেবায় হস্তক্ষেপ করার ফলে এবং যে পদের প্রতি তিনি অত্যন্ত আসক্ত সেই সেবা করার ফলে, তিনি হয়তো আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন। তা হলেও আমি আশা করি যে, আমাদের এই ভুল বোঝাবুঝিতে আপনি আমার পক্ষ অবলম্বন করবেন, কারণ আপনি দীনবৎসল এবং আপনি সর্বদা তুচ্ছ সেবাকেও অনেক বড় করে দেখেন। তাই লক্ষ্মীদেবী আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেও, আমার মনে হয় যে, তাতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না, কারণ আপনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নির্ভরশীল, সুতরাং লক্ষ্মীতেও আপনার তত প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

মা লক্ষ্মী সর্বদা নারায়ণের পদসেবা করেন বলে বিখ্যাত। তিনি একজন আদর্শ পত্নী, কারণ তিনি সর্বতোভাবে নারায়ণের সেবা করেন। তিনি কেবল তাঁর পদসেবাই করেন না, অধিকন্তু তিনি তাঁর গৃহস্থালির সমস্ত কার্যও করেন। তিনি তাঁর জন্য অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাঁর আহারের সময় তাঁকে ব্যজন করেন, তাঁর মুখমণ্ডলে চন্দন লেপন করেন এবং তাঁর শয্যা ও আসন প্রস্তুত করেন। এইভাবে তিনি সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত, এবং তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপে অন্য কোন ভক্তের হস্তক্ষেপ করার কোন রকম সুযোগ থাকে না। পৃথু মহারাজের তাই মনে হয়েছিল যে, লক্ষ্মীদেবী ভগবানের যে সেবা করেন, তিনি যদি সেই সেবা করতে যান, তা হলে লক্ষ্মীদেবী হয়তো তাঁর প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু সমগ্র জগতের জননী মা লক্ষ্মী কেন পৃথু মহারাজের মতো একজন নগণ্য সেবকের প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন? সেটিও সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও পৃথু মহারাজ নিজেকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের কাছে আবেদন করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। পৃথু মহারাজ সাধারণ বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে বা সকাম কর্মে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু ভগবান এতই দয়ালু ও উদার যে, তিনি পৃথু মহারাজকে জীবনের পরম পদ, অর্থাৎ ভক্তি প্রদান করতে প্রস্তুত ছিলেন।

কেউ যখন বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য থাকে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার। এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা কেউই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ভগবান এতই কৃপাময় যে, তাঁর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অতি তুচ্ছ সেবাও তিনি গ্রহণ করেন, এবং তাই *বিষ্ণু পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা যায়। ভগবান যখন প্রসন্ন হন, তখন যজ্ঞকর্তা ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হন। তাই পৃথু

মহারাজ আশা করেছিলেন যে, তাঁর তুচ্ছ সেবা ভগবান স্বীকার করবেন এবং তিনি তা লক্ষ্মীদেবীর সেবা থেকেও শ্রেয় বলে মনে করবেন। লক্ষ্মীদেবীকে বলা হয় চঞ্চলা, কারণ তিনি এক জায়গায় স্থির থাকতে পারেন না। তাই পৃথু মহারাজ ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি যদি ক্রোধবশত চলেও যান, তা হলেও ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কোন ক্ষতি হবে না, কারণ তিনি আত্ম-নির্ভরশীল এবং লক্ষ্মীদেবীর সহায়তা ব্যতীতই তিনি যে-কোন কার্য করতে পারেন। যেমন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মাকে তাঁর নাভি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর সাহায্য গ্রহণ করেননি। লক্ষ্মীদেবী তখন তাঁর পাশে বসে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করছিলেন। সাধারণত পতি যখন পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করেন, তখন যথাসময়ে পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু ব্রহ্মার জন্মের ক্ষেত্রে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীতে গর্ভসঞ্চার করেননি। আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার ফলে, ভগবান তাঁর নাভি থেকে ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেছিলেন। তাই, পৃথু মহারাজের বিশ্বাস ছিল যে, লক্ষ্মীদেবী যদি তাঁর প্রতি রুষ্ট হন, তা হলে ভগবান ও তাঁর উভয়েরই কোন ক্ষতি হবে না।

শ্লোক ২৯

ভজন্ত্যথ ত্বামত এব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্ ।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে ॥ ২৯ ॥

ভজন্তি—আরাধনা করে; **অথ**—অতএব; **ত্বাম্**—আপনি; **অত এব**—সুতরাং; **সাধবঃ**—সাধু ব্যক্তিগণ; **ব্যুদস্ত**—যিনি দূর করেন; **মায়া-গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **বিভ্রম**—ভ্রান্ত ধারণা; **উদয়ম্**—উৎপন্ন হয়; **ভবৎ**—আপনার; **পদ**—চরণ-কমল; **অনুস্মরণাৎ**—নিরন্তর স্মরণ করার ফলে; **ঋতে**—বিনা; **সতাম্**—মহাত্মাদের; **নিমিত্তম্**—কারণ; **অন্যৎ**—অন্য; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ন**—না; **বিদ্মহে**—বুঝতে পারি।

অনুবাদ

মহান মুক্ত পুরুষেরা সর্বদা আপনাকে ভক্তি করে, কারণ ভক্তির প্রভাবেই কেবল মোহময়ী জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। হে ভগবান! মুক্ত পুরুষেরা যে আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁরা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মের কথা চিন্তা করেন।

তাৎপর্য

কর্মীরা সাধারণত দৈহিক সুখের জন্য সকাম কর্মে লিপ্ত হয়। জ্ঞানীরা কিন্তু জড় সুখভোগের প্রতি বিরক্ত। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, চিন্ময় আত্মা হওয়ার ফলে, এই জড় জগতে তাঁদের করণীয় কিছু নেই। আত্ম-উপলব্ধির পর, জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় জ্ঞানীরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *(বহুনাং জন্মনামন্তে)* । ভগবদ্ভক্তির স্তরে না আসা পর্যন্ত আত্মজ্ঞান পূর্ণ হয় না। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, তারা জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত থাকে, বিশেষ করে রজ ও তমোগুণের দ্বারা, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অত্যন্ত লোভী ও কামাতুর থাকে, এবং সারা দিন ও সারা রাত তারা কঠোর পরিশ্রম করে। এই প্রকার অহঙ্কারী জীব নিরন্তর এক যোনি থেকে আর এক যোনিতে দেহান্তরিত হয়, এবং কোন জীবনেই সে শান্তিলাভ করতে পারে না। জ্ঞানীরা সেই সত্য সম্বন্ধে অবগত এবং তাই তাঁরা কর্মত্যাগ করে কর্মসন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কিন্তু তা হলেও সেটি বাস্তবিক সন্তোষের স্তর নয়। আত্ম-উপলব্ধির পরে, জ্ঞানীর জড় জ্ঞান তাঁকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে যায়। তখন তিনি নিরন্তর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে তৃপ্ত হন। পৃথু মহারাজ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যে-সমস্ত মুক্ত পুরুষেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছেন। মুক্তি যদি চরম লক্ষ্য হত, তা হলে মুক্ত পুরুষদের ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করার কোন প্রশ্নই উঠত না। অর্থাৎ, আত্ম-উপলব্ধিজনিত যে আনন্দকে আত্মানন্দ বলা হয়, তা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবার প্রভাবে লব্ধ আনন্দের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। পৃথু মহারাজ তাই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তিনি কেবল নিরন্তর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করবেন এবং তার ফলে তাঁর মন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ হবে। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৩০

মন্যে গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং
বরং বৃণীষ্বেতি ভজন্তমাত্থ যৎ ।
বাচা নু তন্ত্যা যদি তে জনোঽসিতঃ
কথং পুনঃ কর্ম করোতি মোহিতঃ ॥ ৩০ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **গিরম্**—বাণী; **তে**—আপনার; **জগতাম্**—জড় জগতের প্রতি; **বিমোহিনীম্**—মোহকারিণী; **বরম্**—বর; **বৃণীষ্ব**—প্রার্থনা কর; **ইতি**—এইভাবে; **ভজন্তম্**—আপনার ভক্তকে; **আত্থ**—আপনি বলেছেন; **যৎ**—যেহেতু; **বাচা**—বেদের বর্ণনা অনুসারে; **নু**—নিশ্চিতভাবে; **তন্ত্যা**—রজ্জুর দ্বারা; **যদি**—যদি; **তে**—আপনার; **জনঃ**—জনসাধারণ; **অসিতঃ**—বদ্ধ নয়; **কথম্**—কিভাবে; **পুনঃ**—পুনঃ পুনঃ; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **করোতি**—অনুষ্ঠান কর; **মোহিতঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রভু! আপনার অনন্য ভক্তের কাছে আপনি যা বলেছেন তা অত্যন্ত মোহকারিণী। বেদে আপনি যে প্রলোভন প্রদান করেছেন তা অবশ্যই আপনার শুদ্ধ ভক্তদের উপযুক্ত নয়। সাধারণ মানুষেরাই বেদের মধুর বাণীতে মোহিত হয়ে, তাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনঃ পুনঃ সকাম কর্মে রত হয়।

তাৎপর্য

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের একজন মহান আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন যে, যারা বৈদিক সকাম কর্মের প্রতি অর্থাৎ কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের অবশ্যই সর্বনাশ হয়েছে। বেদের তিনটি কাণ্ড রয়েছে, যথা—কর্মকাণ্ড (সকাম কর্ম), জ্ঞানকাণ্ড (দার্শনিক গবেষণা) ও উপাসনা-কাণ্ড (জড়-জাগতিক লাভের জন্য দেব-দেবীদের পূজা)। যারা কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠানে রত, তাদের এই অর্থে সর্বনাশ হয়েছে যে, যারা জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের সকলেরই সর্বনাশ হয়েছে, তা সেই দেহ কোন দেবতার হোক, কোন রাজার হোক অথবা কোন পশুর হোক কিংবা যে দেহই হোক না কেন। সকলের পক্ষেই জড়া প্রকৃতির ত্রিতাপ দুঃখ সমভাবে ক্লেশকর। নিজের চিন্ময় স্থিতি উপলব্ধি করার জন্য যে জ্ঞানের চর্চা, তাও সময়েরই অপচয় মাত্র। জীব যেহেতু ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া। পৃথু মহারাজ সেই জন্য বলেছেন যে, জড়-জাগতিক বরের প্রলোভন হচ্ছে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ রাখার অন্য একটি ফাঁদ। তাই তিনি স্পষ্টভাবে ভগবানকে বলেছেন যে, জড় সুবিধা ভোগের জন্য ভগবান যে তাঁকে বর দিতে চাইছেন, তা অবশ্যই মোহকারিণী। শুদ্ধ ভক্ত কখনই ভুক্তি অথবা মুক্তির প্রতি আগ্রহী নন।

যে-সমস্ত কনিষ্ঠ ভক্তরা জানে না যে, জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রকৃত সুখ প্রদান করবে না, ভগবান কখনও কখনও তাদের বর দান করেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে ভগবান তাই বলেছেন, কোন ঐকান্তিক ভক্ত যদি খুব একটা বুদ্ধিমান না হওয়ার ফলে, ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করেন, তা হলে ভগবান সর্বজ্ঞ হওয়ার ফলে, তাঁকে সেই সমস্ত জাগতিক সুখ-সুবিধা প্রদান করেন না, পক্ষান্তরে তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধাগুলি তিনি তাঁর থেকে নিয়ে নেন, যাতে চরমে সেই ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হতে পারেন। অর্থাৎ, ভক্তের পক্ষে জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা বা লাভ কখনই মঙ্গলজনক নয়। মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিনিময়ে, বেদের যে-সমস্ত নির্দেশগুলি স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে, তা অত্যন্ত মোহকারিণী। তাই *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) ভগবান বলেছেন—*যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য-বিপশ্চিতঃ* । অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা *(অবিপশ্চিতঃ) বেদের* সুন্দর সুন্দর কথায় আকৃষ্ট হয়ে জড়-জাগতিক লাভের জন্য সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তার ফলে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-জন্মান্তরে কঠোর দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

শ্লোক ৩১

ত্বন্মায়য়াদ্ধা জন ঈশ খণ্ডিতো
যদন্যদাশাস্ত ঋতাত্মনোঽবুধঃ ।
যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং
তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিতুম্ ॥ ৩১ ॥

ত্বৎ—আপনার; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অদ্ধা**—নিশ্চিতভাবে; **জনঃ**—জনসাধারণ; **ঈশ**—হে ভগবান; **খণ্ডিতঃ**—বিভক্ত; **যৎ**—যেহেতু; **অন্যৎ**—অন্য; **আশাস্তে**—কামনা করে; **ঋত**—প্রকৃত; **আত্মনঃ**—আত্মা থেকে; **অবুধঃ**—অজ্ঞ; **যথা**—যেমন; **চরেৎ**—প্রবৃত্ত হয়; **বাল-হিতম্**—নিজের সন্তানের কল্যাণ; **পিতা**—পিতা; **স্বয়ম্**—ব্যক্তিগতভাবে; **তথা**—তেমনই; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অর্হসি নঃ সমীহিতুম্**—দয়া করে আমার কল্যাণ সাধন করুন।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনার মায়ার প্রভাবে এই জড়-জগতের সমস্ত জীবেরা তাদের প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়েছে, এবং অজ্ঞানতা-বশত তারা সর্বদাই সমাজ, বন্ধুত্ব ও প্রেমরূপে জড় সুখ কামনা করছে। তাই, দয়া করে আপনি আমাকে কোন রকম

জড়-জাগতিক লাভের জন্য বর প্রার্থনা করতে বলবেন না। পক্ষান্তরে, পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রার্থনার প্রত্যাশা না করে তার কল্যাণের জন্য সব কিছু করেন, তেমনই আপনিও যা কিছু আমার কল্যাণকর বলে মনে করেন তাই করুন।

তাৎপর্য

পুত্রের কর্তব্য হচ্ছে পিতার কাছে কোন কিছু না চেয়ে তার পিতার উপর নির্ভর করা। সৎ পুত্রের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তার পক্ষে যা কল্যাণকর, তার পিতাই তা সব চাইতে ভালভাবে জানেন। তেমনই, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য প্রার্থনা করেন না। এমন কি তিনি কোন রকম পারমার্থিক লাভেরও প্রার্থনা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত, এবং ভগবান সর্বতোভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) বলা হয়েছে—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি* । পিতা তাঁর পুত্রের আবশ্যকতাগুলি জানেন এবং তিনি তার জন্য সেগুলি সরবরাহ করেন। ভগবানও জীবের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি সম্বন্ধে অবগত এবং তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সেগুলি সরবরাহ করেন। তাই *ঈশোপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই জড় জগতের সব কিছুই পূর্ণ *(পূর্ণম্-ইদম্)* । তবে অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, জীব তার স্বরূপ-বিস্মৃত হওয়ার ফলে, অনাবশ্যক সমস্ত বস্তুর চাহিদা সৃষ্টি করছে এবং তার ফলে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। ফলস্বরূপ, জন্ম-জন্মান্তরেও তার জড়-জাগতিক কার্যকলাপ শেষ হয় না।

আমাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তারা সকলেই জন্মান্তর ও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁকে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে দেওয়া, কারণ আমাদের পক্ষে যে কি কল্যাণকর তা তিনি জানেন।

পৃথু মহারাজ তাই ভগবানকে বলেছেন যে, তাঁর পক্ষে যে কি মঙ্গলজনক, তা পরম পিতারূপে তিনিই যেন বিচার করেন। সেটিই হচ্ছে জীবের আদর্শ স্থিতি। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে উপদেশ দিয়েছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

"হে সর্ব-শক্তিমান ভগবান! আমি ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে চাই না, আমি সুন্দরী রমণীর সঙ্গসুখও লাভ করতে চাই না, এবং আমি বহু অনুগামীও আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি কেবল চাই জন্ম-জন্মান্তরে যেন আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ভগবদ্ভক্তির বিনিময়ে শুদ্ধ ভক্তের কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, এবং সকাম কর্ম অথবা দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারাও মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকা। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি।

শ্লোক ৩২

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যাদিরাজেন নুতঃ স বিশ্বদৃক্
তমাহ রাজন্ ময়ি ভক্তিরস্তু তে ।
দিষ্ট্যেদৃশী ধীর্ময়ি তে কৃতা যয়া
মায়াং মদীয়াং তরতি স্ম দুস্ত্যজাম্ ॥ ৩২ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আদি-রাজেন**—আদিরাজা (পৃথু) দ্বারা; **নুতঃ**—পূজিত হয়ে; **সঃ**—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **বিশ্ব-দৃক্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **রাজন্**—হে রাজন্; **ময়ি**—আমাকে; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **অস্তু**—হোক; **তে**—তোমার; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যের দ্বারা; **ঈদৃশী**—এই প্রকার; **ধীঃ**—বুদ্ধিমত্তা; **ময়ি**—আমাকে; **তে**—তোমার দ্বারা; **কৃতা**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **যয়া**—যার দ্বারা; **মায়াম্**—মায়া; **মদীয়াম্**—আমার; **তরতি**—উত্তীর্ণ হয়; **স্ম**—নিশ্চিতভাবে; **দুস্ত্যজাম্**—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন, পৃথু মহারাজের প্রার্থনা শুনে, ব্রহ্মাণ্ডের দ্রষ্টা ভগবান রাজাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—হে রাজন্! আমার ভক্তিবৃত্তিতে তুমি সর্বদাই যুক্ত থেকো। তুমি যা বুদ্ধিমত্তাপূর্বক ব্যক্ত করেছ, কেবল এই প্রকার সৎ উদ্দেশ্যের ফলেই দুর্লঙ্ঘ্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতেও ভগবান বলেছেন যে, মায়া দুর্লঙ্ঘ্য। সকাম কর্মের দ্বারা, মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা অথবা যোগের দ্বারা কেউই এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে না। মায়াকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। সেই কথা ভগবান নিজেই বলেছেন—*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৪)। কেউ যদি ভবসমুদ্র পার হতে চায়, তা হলে ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নেই। তাই ভগবদ্ভক্তের স্বর্গে অথবা নরকে কোথাও কোন রকম জড়-জাগতিক স্থিতির অপেক্ষা করা উচিত নয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকবেন, কারণ সেটি হচ্ছে তাঁর প্রকৃত বৃত্তি। সেই অবস্থায় স্থির হয়ে জীব জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারে।

শ্লোক ৩৩

তত্ত্বং কুরু ময়াদিষ্টমপ্রমত্তঃ প্রজাপতে ।
মদাদেশকরো লোকঃ সর্বত্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ৩৩ ॥

তৎ—অতএব; **ত্বম্**—তুমি; **কুরু**—কর; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আদিষ্টম্**—আদেশ; **অপ্রমত্তঃ**—বিভ্রষ্ট না হয়ে; **প্রজা-পতে**—হে প্রজাদের প্রভু; **মৎ**—আমার; **আদেশ-করঃ**—আজ্ঞা-পালনকারী; **লোকঃ**—কোন ব্যক্তি; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **শোভনম্**—সমস্ত সৌভাগ্য।

অনুবাদ

হে রাজন্! হে প্রজাপালক! এখন থেকে অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে তুমি আমার আদেশ পালন কর এবং কখনও কোন কিছুর দ্বারা বিভ্রষ্ট হয়ো না। যে শ্রদ্ধাপূর্বক এইভাবে আমার আজ্ঞা পালন করে, তার সর্বত্র মঙ্গল হয়।

তাৎপর্য

ধর্মজীবনের মূল তত্ত্ব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ পালন করা, এবং যিনি তা করেন তিনি পূর্ণরূপে ধার্মিক। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৫) পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—"সর্বদা কেবল আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও।" তার পর (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) তিনি বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।" সেটিই হচ্ছে ধর্মের মূল তত্ত্ব। যিনি ভগবানের এই

আদেশ পালন করেন, তিনিই বাস্তবিক ধার্মিক। অন্য সকলকে ভণ্ড বলা হয়েছে, কারণ ধর্মের নামে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা রকম কার্যকলাপ চলছে, যেগুলি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম নয়। কিন্তু যিনি ভগবানের নির্দেশ পালন করেন, তাঁর সর্বত্র মঙ্গল হয়।

শ্লোক ৩৪

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি বৈণ্যস্য রাজর্ষেঃ প্রতিনন্দ্যার্থবদ্বচঃ ।
পূজিতোঽনুগৃহীত্বৈনং গন্তুং চক্রেঽচ্যুতো মতিম্ ॥ ৩৪ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **বৈণ্যস্য**—রাজা বেণের পুত্র (পৃথু মহারাজ); **রাজর্ষেঃ**—রাজর্ষির; **প্রতিনন্দ্য**—সমাদর করে; **অর্থ-বৎ বচঃ**—সারগর্ভ প্রার্থনা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়ে; **অনুগৃহীত্বা**—প্রভূতভাবে অনুগ্রহ করে; **এনম্**—মহারাজ পৃথুর; **গন্তুম্**—সেখান থেকে প্রস্থান করতে; **চক্রে**—স্থির করেছিলেন; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান; **মতিম্**—তাঁর মন।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুত পৃথু মহারাজের সারগর্ভ প্রার্থনার প্রচুর সমাদর করলেন। এইভাবে তাঁর দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, এবং সেখান থেকে তিনি প্রস্থান করতে ইচ্ছা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *প্রতিনন্দ্যার্থবদ্ বচঃ* শব্দগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান রাজার অর্থপূর্ণ প্রার্থনার সমাদর করেছিলেন। ভক্ত জড়-জাগতিক লাভের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না; তিনি কেবল তাঁর কৃপা লাভের জন্য প্রার্থনা করেন; তিনি প্রার্থনা করেন, জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় তিনি যেন যুক্ত হতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন, *মম জন্মনি জন্মনি,* অর্থাৎ 'জন্ম-জন্মান্তরে', কারণ ভক্ত জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হওয়ারও অভিলাষী নন। ভগবান ও তাঁর ভক্ত এই জড় জগতে বারবার জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু এই প্রকার জন্ম অপ্রাকৃত। *ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি ও অর্জুন উভয়েই পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করেছেন, অর্জুন তা ভুলে

গেছেন কিন্তু তাঁর সব কিছু মনে আছে। ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত বহুবার জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যেহেতু এই প্রকার জন্ম অপ্রাকৃত, তাই ভৌতিক জন্মের কষ্টকর পরিস্থিতি থেকে তাঁরা মুক্ত, এবং তাই তাদের বলা হয় দিব্য।

ভগবান ও তাঁর ভক্তের জন্ম যে দিব্য তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য। ভগবানের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রকৃত ধর্ম ভগবদ্ভক্তির প্রতিষ্ঠা করা, এবং ভক্তের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সেই ধর্মের পন্থা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে প্রচার করা। পৃথু মহারাজ ছিলেন ভগবদ্ভক্তি প্রচার করার জন্য ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, এবং তাঁর সেই স্থিতিতে স্থির থাকতে ভগবান তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। এইভাবে মহারাজ যখন কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের বর গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, তখন ভগবান তাঁর সেই প্রত্যাখ্যানের প্রশংসা করেছিলেন। এই শ্লোকে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *অচ্যুত* । ভগবান যদিও এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তবুও তিনি বদ্ধ জীবদের মতো পতনশীল নন। ভগবান যখন প্রকট হন, তখন তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তাঁর দিব্য স্থিতিতে বিরাজ করেন, এবং তাই *ভগবদ্গীতায়* তাঁর আবির্ভাবের তত্ত্ব বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন *আত্ম-মায়য়া,* 'তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত'। *অচ্যুত* হওয়ার ফলে, ভগবান এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য নন। তিনি আসেন ধর্ম সংস্থাপন করতে এবং মানব-সমাজকে আসুরিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে।

শ্লোক ৩৫-৩৬

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্বসিদ্ধচারণপন্নগাঃ ।
কিন্নরাপ্সরসো মর্ত্যাঃ খগা ভূতান্যনেকশঃ ॥ ৩৫ ॥
যজ্ঞেশ্বরধিয়া রাজ্ঞা বাগ্বিত্তাঞ্জলিভক্তিতঃ ।
সভাজিতা যযুঃ সর্বে বৈকুণ্ঠানুগতাস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

দেব—দেবতাগণ; **ঋষি**—মহর্ষিগণ; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধ**—সিদ্ধলোকের অধিবাসীগণ; **চারণ**—চারণলোকের অধিবাসীগণ; **পন্নগাঃ**—নাগলোকের অধিবাসীগণ; **কিন্নর**—কিন্নরলোকের অধিবাসীগণ; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **মর্ত্যাঃ**—মর্তলোক-বাসীগণ; **খগাঃ**—পক্ষী; **ভূতানি**—অন্য সমস্ত জীব; **অনেকশঃ**—বহু; **যজ্ঞ-ঈশ্বর-ধিয়া**—নিজেকে ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে মনে করার যথার্থ বুদ্ধিসহকারে; **রাজ্ঞা**—রাজার দ্বারা; **বাক্**—মধুর বাক্যে; **বিত্ত**—সম্পদ; **অঞ্জলি**—বদ্ধাঞ্জলি হয়ে;

ভক্তিতঃ—ভক্তিসহকারে; **সভাজিতাঃ**—যথাযথভাবে পূজিত হয়ে; **যযুঃ**—প্রস্থান করেছিলেন; **সর্বে**—সকলে; **বৈকুণ্ঠ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **অনুগতাঃ**—অনুগামীগণ; **ততঃ**—সেই স্থান থেকে।

অনুবাদ

দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, কিন্নর, অপ্সরা, মর্ত্যলোকবাসী, পক্ষী এবং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত অন্যান্য সমস্ত জীবদের, এবং পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর পার্ষদদের অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পৃথু মহারাজ সুমধুর বাণীর দ্বারা এবং যথাসম্ভব সম্পদ প্রদান করে পূজা করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পর, তাঁরা সকলে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজে মনে করা হয় যে, পৃথিবীতেই কেবল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমন্বিত বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব রয়েছে, অন্যান্য লোকে জীবন নেই। বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু এই মূর্খ মতবাদ স্বীকার করা হয় না। *বেদের* অনুগামীরা পূর্ণরূপে জানেন যে, অন্যান্য লোকে দেবতা, ঋষি, পিতৃ, গন্ধর্ব, পন্নগ, কিন্নর, চারণ, সিদ্ধ, অপ্সরা আদি বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। বেদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কেবল এই জড় জগতের গ্রহগুলিতেই নয়, চিৎ-জগতেও বিভিন্ন প্রকার জীব রয়েছে। যদিও এই সমস্ত জীবেরা গুণগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মতো চিন্ময়, তবুও মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি জড় উপাদান দ্বারা রচিত বিভিন্ন প্রকার দেহে তারা বিরাজ করছে। চিৎ-জগতে কিন্তু এই প্রকার দেহ ও দেহীর পার্থক্য নেই। জড় জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার শরীরে আকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা পূর্ণরূপে জানতে পারি যে, জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেই প্রতিটি লোকে বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন জীব রয়েছে। পৃথিবী হচ্ছে ভূর্লোকের একটি গ্রহ। ভূর্লোকের ঊর্ধ্বে ছয়টি লোক রয়েছে এবং নিম্নে সাতটি লোক রয়েছে। তাই ব্রহ্মাণ্ডকে বলা হয় চতুর্দশ ভুবন, অর্থাৎ তাতে চৌদ্দটি লোক রয়েছে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সমন্বিত জড় আকাশের ঊর্ধ্বে আর একটি আকাশ রয়েছে, যাকে বলা হয় *পরব্যোম* বা চিদাকাশ, যেখানে চিন্ময় লোকসমূহ রয়েছে। সেই সমস্ত লোকের অধিবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানের বিবিধ প্রকার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত। তাদের সেই সেবা বিভিন্ন প্রকার রস বা সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই রসগুলি হচ্ছে দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্য-রস, মাধুর্যরস ও সর্বোপরি পরকীয়-রস। শ্রীকৃষ্ণ

যেখানে বিরাজ করেন, সেই কৃষ্ণলোকেই কেবল এই পরকীয়-রস বিদ্যমান। সেই গ্রহ লোকটিকে গোলোক বৃন্দাবন বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও সেখানে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি অনন্তকোটিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন। তাঁর একটি রূপে তিনি এই জড় জগতে বৃন্দাবন-ধাম নামক একটি বিশেষ স্থানে আবির্ভূত হন, এবং সেখানে তিনি বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আকর্ষণ করতে তাঁর গোলোক বৃন্দাবন ধামের লীলা প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৩৭

ভগবানপি রাজর্ষেঃ সোপাধ্যায়স্য চাচ্যুতঃ ।
হরন্নিব মনোঽমুষ্য স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **অপি**—ও; **রাজ-ঋষেঃ**—রাজর্ষির; **স-উপাধ্যায়স্য**—পুরোহিতগণ সহ; **চ**—ও; **অচ্যুতঃ**—অচ্যুত ভগবান; **হরন্**—মুগ্ধ করে; **ইব**—যেন; **মনঃ**—মন; **অমুষ্য**—তাঁর; **স্ব-ধাম**—নিজের ধামে; **প্রত্যপদ্যত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

পুরোহিতসহ রাজার মন হরণ করে, অচ্যুত ভগবান চিদাকাশে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান যেহেতু চিন্ময়, তাই তিনি তাঁর দেহের পরিবর্তন না করে, এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন, এবং তাই তাঁকে বলা হয় *অচ্যুত* । জীব যখন এই জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে একটি জড় শরীর ধারণ করতে হয়, এবং তাই জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবকে *অচ্যুত* বলা যায় না। ভগবানের সেবা থেকে বিচ্যুত হয়ে অধঃপতিত হওয়ার ফলে, জড় জগতে দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য অথবা জড় জগতের দুঃখময় পরিবেশে সুখ ভোগের চেষ্টা করার জন্য জীব একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়। তাই অধঃপতিত জীবদের বলা হয় *চ্যুত*, কিন্তু ভগবানকে বলা হয় *অচ্যুত* । ভগবান সকলের কাছেই আকর্ষণীয়। তিনি কেবল রাজা ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আসক্ত পুরোহিতদের কাছেই নয়, সকলের কাছে আকর্ষণীয়। ভগবান যেহেতু সর্বাকর্ষক, তাই তাঁকে বলা হয় কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণের কলা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ভগবান পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু জড় সৃষ্টির মূল কারণ কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। কারণোদকশায়ী বিষ্ণু প্রথমে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণকারী গুণাবতারদের অন্যতম।

শ্লোক ৩৮

অদৃষ্টায় নমস্কৃত্য নৃপঃ সন্দর্শিতাত্মনে ।
অব্যক্তায় চ দেবানাং দেবায় স্বপুরং যযৌ ॥ ৩৮ ॥

অদৃষ্টায়—জড় দৃষ্টির অতীত যিনি তাঁকে; **নমঃ-কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **নৃপঃ**—রাজা; **সন্দর্শিত**—প্রকাশিত; **আত্মনে**—পরমাত্মাকে; **অব্যক্তায়**—যিনি জড় জগতের প্রকাশের অতীত; **চ**—ও; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **দেবায়**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **স্ব-পুরম্**—তাঁর গৃহে; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

পৃথু মহারাজ তখন সমস্ত দেবতাদের পরম দেবতা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান যদিও জড় দৃষ্টির অগোচর, তবুও তিনি পৃথু মহারাজের দৃষ্টিপথে নিজেকে প্রকাশিত করেছিলেন। ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করার পর, পৃথু মহারাজ তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড় দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু জড় ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় উন্মুখ হওয়ার ফলে শুদ্ধ হয়, তখন ভগবান তাঁর ভক্তের দৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশিত করেন। *অব্যক্ত* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'অপ্রকাশিত' । এই জড় জগৎ যদিও ভগবানের সৃষ্ট, তবুও জড় দৃষ্টিতে তিনি অপ্রকাশিত। মহারাজ পৃথু তাঁর শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে চিন্ময় দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। এখানে তাই ভগবানকে *সন্দর্শিতাত্মা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি সাধারণ দৃষ্টিতে অপ্রকাশিত হলেও, তাঁর ভক্তের দৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'পৃথু মহারাজের যজ্ঞস্থলে ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব' নামক বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।